৪৪তম বর্ষ • ৪র্থ সংখ্যা • অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
জাগিয়ে দেয়যে মরণ	সংযুক্তা সিংহ	
নিরাপত্তা	অনার্য মিত্র	৩
উৎসবের আব্বুলিশ	অরুণালোক ভট্টাচার্য্য	৩
হৃদয় বিদারক মৃত্যু	মোহিত রণদীপ	৪
আমাদের কি ঘুম ভাঙবে না	সুদেষ্ণা ঘোষ	৬
লক্ষ্মণরেখা	দীপাবলি সেন	৮
শাঁখা-সিঁদুর-ঘোমটা	শান্তিসুধা ঘোষ	১০
প্রযুক্তির পুনরুজ্জীবন	রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়	১৩
জলবায়ু পরিবর্তন	অঞ্জন কুমার সেনশর্মা	১৫
মেডিসিনে বরফের ব্যবহার	জয়ন্ত ভট্টাচার্য	১৮
বার্ধক্যে স্মৃতিশক্তি কম হওয়া	গৌতম মিস্ত্রী	২৪
অরণ্য তুমি কার	শান্তনু গুপ্ত	২৭
সেলাম আশীষদা	রানা খান	২৯
প্রতিবেদন		৩০

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয় ঃ খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন বি ৪, এস - ৩, পোঃ- (আর) গোপালপুর নারায়ণপুর কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট:www.utsomanush.com/

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

ফেসবুক:http://www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

জাগিয়ে দেয় যে মরণ

সংযুক্তা সিংহ

সবার আগে একটা কথা খুব স্পষ্টভাবে বলা দরকার। না, বানতলা, ধানতলা, হাথরস, উন্নাও, কাঠুয়ার সঙ্গে আর জি কর হাসপাতালের ঘটনা তুলনীয় নয়। ধর্ষণ, হত্যার ঐ ঘটনাগুলির কোনওটিই কর্মক্ষেত্রে ঘটেনি। সারা দেশ যে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে আর সেই গর্জন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, যার ঢেউ আছড়ে পড়েছে দেশের বাইরেও, তার সবচেয়ে বড় কারণ হয়তো এটাই। নিজের কাজের জায়গায়, সরকারি হাসপাতালে, একজন মহিলা চিকিৎসকের ওপর এত ভয়ঙ্কর নৃশংসতার নজির কেউ দেখাতে পারেন নি। অনেকে মনে করাচ্ছেন মুম্বাইয়ের হাসপাতালের ধর্ষিত নার্স অরুণা শনবাগের কথা। মৃত্যু যাঁকে নিষ্কৃতি দিয়েছিল ৪২ বছরের কোমাচ্ছন্ন জীবন থেকে। কিন্তু চারতলার সেমিনার রুমে ৯ আগস্ট সকালে পিজি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী চিকিৎসকের বিবস্ত্র বিক্ষত দেহ আবিষ্কারের পর এখনও জানা যায়নি, ৩৬ ঘণ্টা টানা ডিউটি করে ক্লান্ত, ঘুমন্ত মেয়েটার ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল কজন! ময়নাতদন্তের রিপোর্টে শরীর জুড়ে আঘাতের যে বিবরণ শোনা গেছে, তাতে ক্রমশ পোক্ত হয়েছে গণধর্ষণের অনুমান। পুলিশের বড় কর্তা বা রাজ্যের সর্বময় কর্ত্রী, প্রাথমিক তদন্ত পর্বের কুশলতা নিয়ে যতই বড়াই করুন, ঘটনা জানাজানি হবার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রকৃত সত্য ধামাচাপা দেবার সন্দেহ উস্কে দিয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, একজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার, তার সিভিক ভলান্টিয়ার পরিচয় পুলিশ কর্তার এড়িয়ে যাওয়া—দৃশ্যতই দুর্বল চিত্রনাট্য। আদালতের নির্দেশে তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে যাবার পর অকুস্থলের কাছে ভাঙাভাঙি শুরু করা, সেই কাঁচা চিত্রনাট্যেরই অংশ। সেমিনার রুমই প্রকৃত অকুস্থল কিনা, এখন তো সে প্রশ্নও উঠছে।

তবে, সোশ্যাল মিডিয়ার একটা আহ্বান যে এত মেয়েকে ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে রাস্তায় টেনে আনবে,

উই ওয়ান্ট জাস্টিস গর্জন কলকাতা শহরের রাজপথ ছাপিয়ে ছড়িয়ে যাবে রাজ্যের সর্বত্র, চিত্রনাট্যকার হয়তো তা অনুমান করতে পারেননি। করা সম্ভবও ছিল না। নবতিপর নারীর সঙ্গে হাঁটছেন মধ্য তিরিশের যুবক। ষাটোর্ধ পুরুষের পাশে স্লোগান দিচ্ছেন কুড়ি পেরোনো তরুণী। কারো হাতে মোমবাতি, কারো মশাল। কেউ তুলে ধরেছেন পোস্টার, কেউ প্ল্যাকার্ড। টেলিভিশনের পর্দায় সেই আশ্চর্য অভূতপূর্ব দৃশ্য, জনজাগরণের এক নতুন কাহিনীর জন্ম দিচ্ছে। অনেকে বলছেন, চমকে দেওয়া এ দৃশ্য, শাসকের স্নায়ুর ওপর কতটা চাপ সৃষ্টি করেছিল, ঐ রাতে আর জি কর হাসপাতালে গুণ্ডাবাহিনীর তাণ্ডব তার প্রমাণ। স্বীকার করতেই হবে, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস, অবস্থান মঞ্চ ভেঙে তছনছ আর আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে ক্যামেরার চোখ অন্যদিকে ঘোরানোর সেই মরিয়া চেষ্টা আপাত সফল হয়েছিল। কিন্তু তাতে জনরোষ আরও বেড়েছে। দেশ জুড়ে কর্মবিরতিতে নেমেছেন ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীরা। দুর্বৃত্ত তাণ্ডবের দায় বাম আর রামের ঘাড়ে চাপানোর কাউন্টার ন্যারেটিভ কাজে আসেনি। বরং আরও গাঢ় হয়েছে প্রমাণ লোপাটের সন্দেহ। দুর্বৃত্তদের রাজনৈতিক আনুগত্যও গোপন থাকছে না। হামলার সময় রক্ষাকর্তা পুলিশের ভূমিকা এখন আতস কাচের নীচে। প্রকাশ্যে আসছে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অন্দরের রোমহর্ষক নানা কেচ্ছা কাহিনী। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে অনেক অডিও ক্লিপ, ভিডিও। কোনটা সত্যি, কোনটা ভুয়ো, যাচাই করার উপায় নেই। প্রয়োজনও মনে করছেন না সবাই। শিউরে উঠছেন, ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটিতে চিকিৎসার আড়ালে চলা অশুভ চক্রের কথা জেনে। মেয়েটাকে কি তবে এই চক্রের হাতেই মরতে হল? এত নৃশংসতা কি কোনও আক্রোশবশত? নাহলে প্রথমে আত্মহত্যা কেন বলা হবে? খুনের অভিযোগ দায়ের হবে না কেন? মৃত মেয়েকে দেখার জন্য মা বাবাকে কেন অপেক্ষা করতে হবে তিন ঘণ্টা? দেহের সৎকার করার এত তাড়াই বা ছিল কেন পুলিশের? সিবিআই তদন্তে আপত্তি নেই বলেও কেন গড়িমসি করলেন সরকার মুখ্য? যে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগ, মৃতার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর ইস্তফা গ্রহণ না করে আর এক হাসপাতালে পাঠানোর ঘোষণা, সরকারের চরম অসংবেদী মনোভাবকেই বেআব্রু করে নি কি? স্রোতের মতো ধেয়ে আসা প্রশ্নের কোনও জবাব নেই প্রশাসনের কাছে। অস্বস্তি, মতভেদ বাড়ছে শাসক দলের অভ্যন্তরেও। দিশেহারা দেখাচ্ছে তাদের। কিছুই নিয়ন্ত্রণে থাকছে না। একটা মৃত্যু, নাড়িয়ে দিয়েছে, জাগিয়ে দিয়েছে অগুন্তি মানুষকে।

জানতে ইচ্ছে করে, শাসক দলের দোর্দণ্ড প্রতাপ বাহুবলী নেতা আর তার দলবলের দীর্ঘ শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঁশ লাঠি ঝাঁটা হাতে সন্দেশখালির যে মহিলারা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, যাঁদের তুমুল বিক্ষোভের সামনে হাত জোড় করে ভুল স্বীকার করতে দেখা গিয়েছিল পুলিশ কর্তাদের, যে স্বতঃস্ফূর্ত গণরোষ, ফায়দাসর্বস্ব রাজনীতির কানা গলিতে পথ হারিয়েছিল, প্রতিদিনের বেঁচে থাকার সংগ্রামে বলদর্পীদের হাতে অপমানিত, লাঞ্ছিত সেই প্রান্তিক নারীদের কাছে কি পৌঁছেছিল রাত দখলের বার্তা? তাঁরাও কি একাত্ম বোধ করছেন ন্যায়ের দাবিতে জনগর্জনের সঙ্গে?

পার্ক স্ট্রিট থেকে কামদুনি, মধ্যমগ্রাম থেকে হাঁসখালি, দাড়িভিট থেকে আমতা, প্রতিটি অপরাধে শাসকের ভাষ্য মুখ বুজে মেনে না নিয়ে যদি আজকের মতো পথে নামত সাধারণ মানুষ, ভয় না পেয়ে চোখে চোখ রেখে পাল্টা প্রশ্ন করত, ৩১ বছরের সম্ভাবনাময় জীবনটা কি তাহলে রক্ষা পেত? চিত্রনাট্য কি তবে অন্যরকম হত? কে জানে!

উমা

এটি সম্প্রচারিত হয়েছিল আকাশবাণী গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গ থেকে সমীক্ষায় সম্প্রচারিত হয় ১৮ আগস্ট ২০২৪-এ।

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া পত্রিকার কোনও অংশের কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। — সম্পাদকমণ্ডলী

নিরাপত্তা

অনার্য মিত্র

১.
যারা করেছিল দোষ
তাদেরই আড়াল করার জন্য
তাতিয়ে তুলছো 'ফোঁস'।

তাতানো ফোঁসেই ফণা তোলে যারা
কীই বা তাদের দোষ,
উদার হস্তে তাদের জন্য
মুক্ত যে রাজকোষ।

তাতানো মাতানো ক্ষমতা-বিলাসে
যত হুংকার, রোষ
তারও চেয়ে ঢের স্পর্ধায় কাঁপে
মানুষের আক্রোশ।

অপরাধী যারা, তাদের বাঁচাতে
মানালে যাদের পোষ,
তারা একদিন তোমাকে গিলতে
করতেও পারে ফোঁস।

২.
দিন খুঁজে দাও, একটা রাত্রি
নেই ধর্ষণ হত্যা,
নিয়ত প্রশ্ন তুলতেই থাকে
শঙ্কিত নিরাপত্তা।

বাহুবলীদের চক্রের ফাঁদে
ছড়ানো রয়েছে ত্রাস
রক্ত চোখের ভীতি সঞ্চারে
টিকে থাকা বারোমাস।

শাস্তি চাইছি কাদের?
কাদেরই বা চাই ফাঁসি?
এক ফাঁসিতেই হতে পারবো তো
স্বর্গের অধিবাসী?

কোথায় দেব যে নাড়া
গভীরতর যে ক্ষত,
সভ্যতম যে মানবিক মুখ
তাও তো অস্তগত।

অস্তমিত সে-জীবন ফেরাতে
দু-কূল প্লাবিত ঢেউ
তুলতেই যেন হাতে হাত রেখে
পিছিয়ে না-থাকি কেউ।

উ মা

উৎসবের আব্বুলিশ .....

অরুণালোক ভট্টাচার্য

বে-নিয়মের বঙ্গদেশে—
আইন কানুন বড্ড ক্লিশে।
খুন যদি কেউ হয়েই পড়ে,
পুলিশ এসে চশমা নাড়ে।
বলে এ তো স্যুসাইড হ্যয়—
জলদি লাও গরম চায়।।

সেথায় রাত্রে হাসপাতালে—
ধর্ষণ হয় সেমিনার হলে।
প্যায়দা-টিচার-ছেলেপুলে—
জায়গা সাফাই সবাই মিলে।
গান ধরবেন নগরপাল—
আরে ছিছি এত্তা জঞ্জাল।।

এসব ব্যাপার দেখেশুনে—
রাত ভোর হয় আন্দোলনে।
আশাহীনতার একটি মাস,
হাকিম বলেন সর্বনাশ।
কাজ না করে বিচার চাওয়া?
বিচারটা কি হাতের মোওয়া?

সিন্ডিকেটেই বঙ্গ ভঙ্গ—
রাজামশাই দেখেন রঙ্গ।
উৎসব আসছে বন্ধ শোক,
এবার একটু ফূর্তি হোক।
রাজা খেলেন নিয়ম ভেঙে—
অভয়া মরে রক্তে রেঙে।

সুকুমার রায়ের 'একুশে আইন' অবলম্বনে

উ মা

হৃদয়-বিদারক এক মৃত্যু এবং অমিত এক সম্ভাবনার জন্ম

মোহিত রণদীপ

৯ আগস্ট পৃথিবীর ইতিহাস কলঙ্কিত হয়ে আছে নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলার কারণে। এই দিনটি আমাদের এই রাজ্যের ইতিহাসেও কলঙ্কিত হয়ে থাকল নতুন করে। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। অভিযোগ উঠল ধর্ষণের। নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা রাজ্যস্তরের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মধ্যে এমন ঘটনা অভাবনীয়! যেখানে সর্বক্ষণ চিকিৎসক, নার্স, চিকিৎসাকর্মী কর্মব্যস্ত থাকেন, সেখানে এমন ঘটনা কীভাবে ঘটল সেটা আশ্চর্যের!

এমন এক নৃশংস ঘটনার পর প্রশাসনের ভূমিকা যা হওয়ার কথা ছিল, বাস্তবে তা ছিল না।

১৪ আগস্টের রাতে সারা রাজ্য জুড়ে মেয়েদের রাত দখলের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে দলে দলে মানুষ বেরিয়ে এলেন পথে। সমস্ত কিছু মানিয়ে নেওয়া, মেনে নেওয়াই যেখানে স্বাভাবিক হিসাবে গণ্য হত, সেখানে এই ঘটনার অভিঘাতে রাজ্যজুড়ে এক অভূতপূর্ব জনজাগরণের সাক্ষী হলেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে নানাবিধ অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষের পুঞ্জীভূত প্রতিবাদী আবেগ ভিসুভিয়াস-সম উদ্গীরণের চেহারা নিল। সেই রাতেই আর জি কর হাসপাতলে কার্যত নিষ্ক্রিয় পুলিশের সামনে দলবদ্ধ দুষ্কৃতী হামলা এবং প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা মানুষের জমে থাকা ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করল।

'রাষ্ট্র যখন অরাজক কিংবা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন বিরুদ্ধতা নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য।' মহাত্মা গান্ধীর এই কথারই বাস্তবায়ন দেখছি দেশজুড়ে। মানুষ অনেকদিন ধরে চলতে থাকা নারীর প্রতি হিংসা-নির্যাতন এবং সার্বিক অরাজকতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করেছে।

তবে এই জনজাগরণ বহুবিধ সম্ভাবনার দ্বারও উন্মুক্ত করেছে। যার মধ্যে অন্যতম হল, নারী সমাজ এবং প্রান্তিক যৌনতার সুরক্ষা এবং সমানাধিকারের দাবি। লিঙ্গ সাম্যের এই দাবি এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান হিসেবে উঠে এসেছে। এই স্লোগানকে শুধুমাত্র স্লোগানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে পরিচালিত করার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই সম্ভাবনার বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব যখন লিঙ্গ-সাম্যের ধারণা সমাজে আর্থিক ও সামাজিকভাবে একেবারে পিছিয়ে থাকা পরিবারের নারীদের মধ্যেও অন্যতম আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠবে। সবার আগে আমাদের মনের গভীরে হাজার হাজার বছর ধরে লালিত পুরুষতন্ত্রের ভাইরাসকে চেনা প্রয়োজন।

'সব সাজানো।' 'অমন সব পোশাক পরলে যা হওয়ার তাই হয়েছে।' 'কিচ্ছু হয় নি, ও শুধু খদ্দেরদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি।' 'ও কেন গিয়েছিল মাঝরাতে সেমিনার রুমে?' 'ধর্ষণের শাস্তি হোক ফাঁসি।' 'জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হোক। নির্মমভাবে মারা হোক।' 'নপুংসক করে দাও।'

এ সব উচ্চারণ সাম্প্রতিক দিনগুলোতে উঠে এসেছে আমাদেরই কণ্ঠস্বরে, নারীর ওপর যৌন-নির্যাতনের প্রেক্ষিতে।

কখনও আমরা দায় চাপাতে চেয়েছি অভিযোগকারিণীর ওপর, নির্যাতিতার ওপর। আমাদের এই সব উচ্চারণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমাদেরই সংবেদনহীন, দায়বোধহীন, নির্মম, হিংস্র মনে ছবি। আমরা দায়িত্ব এড়াতে চেয়েছি সব দোষ 'তার' ওপর চাপিয়ে। নেহারবানু থেকে পার্ক স্ট্রিটের সেই নারী বিচার চাইতে গিয়ে পেয়েছেন অপবাদ, গঞ্জনা, অবহেলা। আমাদেরই সমর্থনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে, শাসকের কাছে। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের কণ্ঠস্বরেও সেই স্বরই দেখা গেছে।

'রাজা আসে, রাজা যায়। এই রাজা আসে, ওই রাজা যায়। জামা-কাপড়ের রং বদলায়, ঢঙ বদলায়। দিন বদলায় না।' নির্যাতিতা নারীকেই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। তদন্তকারী অফিসার সক্রিয়তা দেখালে কম গুরুত্বের দপ্তরে বদলি হতে হয়। নির্যাতিতা নারীকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড়াতে হয়, 'কেন গিয়েছিলে পার্ক স্ট্রিটের বারে অত রাতে?' হেনস্থা হওয়া কিশোরীকেই জিজ্ঞাসা করা হয়, 'স্লিভলেস, ছোট স্কার্ট পরে কেন হেঁটেছিলে রাস্তায়?'

আমাদের এই দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া, আমাদের এই সংবেদনহীন প্রশ্ন করার মধ্যেই রয়েছে সেই পুরুষতান্ত্রিক মন। যারা সব দায় নারীর ওপর চাপিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায়। নিজের আধিপত্যকামী, আগ্রাসী, অপরাধপ্রবণ মনটাকে প্রশ্ন করে না।

পুরুষের এই মন তৈরি হয় শৈশব থেকেই, আমাদের পারিবারিক-সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই। এখনও আমাদের সমাজে অধিকাংশ পরিবারে কন্যাসন্তান ততটা কাঙ্ক্ষিত নয়, যতটা পুত্রসন্তান। কন্যাভ্রূণ হত্যা এ দেশে 'উন্নয়ন', 'প্রগতি' এই সব শব্দের বিপ্রতীপে অন্য এক বাস্তবকে সামনে এনে দাঁড় করায়, যা শুধুই লজ্জার। শৈশব থেকেই অবহেলা আর অনাদর সম্বল করে তার বড় হয়ে ওঠা। কন্যাসন্তানের মনের ডানাকে মেলতে দিই না আমরা। ঘুম পাড়ানি ছড়া 'খোকা'-কে মাছ ধরতে পাঠায় 'ক্ষীর নদীর কূলে', তার সামনে উন্মুক্ত করে দেয় সম্পূর্ণ প্রকৃতি আর পরিবেশ। অন্যদিকে, ছোট্ট মেয়েটির মনে বুনে দেয় শুধুই নিষ্ক্রিয় অপেক্ষার বার্তা। ছেলেদের জন্য খোলা মাঠ, ছুটোছুটি, দৌড়ঝাঁপ আর মেয়েদের জন্য পুতুলের সংসার। বাইরের জগৎ, তার উন্মুক্ত পরিবেশ, বর্ণময় অভিজ্ঞতা থেকে এখনও বঞ্চিত দেশের অধিকাংশ মেয়েই। পুরুষ-সন্তান সব ক্ষেত্রেই পায় অগ্রাধিকার, কন্যা-সন্তান সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। কৈশোরের শুরুতে যখন যৌন লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করে, তখন অবস্থা আরও সঙ্গিন হয়ে ওঠে। ছেলেদের জন্য শুরু হয় 'পুরুষালি' হয়ে ওঠার প্রতিযোগিতা। রোগা, লাজুক, কোমল স্বভাবের ছেলেটির জন্য অপেক্ষা করে বিদ্রূপ আর হেনস্থা। আর মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট হয় একদিকে বিধিনিষেধের নানা শৃঙ্খল, অন্য দিকে 'শরীর সর্বস্ব' 'মেয়েলি' হয়ে ওঠার নানা উপকরণ। এইভাবেই টিকে থাকে লিঙ্গ বৈষম্য। সামাজিক এই বৈষম্যটি বিদ্যালয়েও বজায় থাকে। সেখানেও পুরুষতান্ত্রিক মনটাই লালিত হতে থাকে। নারী শৈশব থেকেই পুরুষতন্ত্রের ছাঁচে নিজেকে অভ্যস্ত করে নিতে শেখে। তাই কোনও হিন্দু বিবাহিতা বঙ্গনারী শাঁখা-সিঁদুর-নোয়া না পরলে বিরূপ মন্তব্যটি সাধারণত উঠে আসে কোনও নারী কণ্ঠেই।

আমাদের এই সমাজকাঠামো ক্ষমতার পিরামিড বিন্যাসে বিন্যস্ত। সেই বিন্যাসের উপরিতলে অবস্থান পুরুষের। আমাদের এই মানব সমাজ শুধুমাত্র পুরুষ এবং নারীতে বিভক্ত নয়। নারী ও পুরুষের মাঝে রয়েছে যৌনতার ভিন্নতর অবস্থান। সেখানে যেমন সমকামী মানুষ আছেন, তেমনি আছেন ট্রান্স সেক্সুয়াল মানুষ। যে কারণে ভিন্ন যৌনতার আন্দোলনের পতাকার রঙ হয়ে ওঠে রামধনু রঙে রাঙা।

অন্যকে আঘাত করা নয়, অন্যের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা আর সম্মানের মনোভাব গড়ে উঠুক ছোটবেলা থেকেই। গড়ে উঠুক অন্যের অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার মনোভাব। নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা, হিংসা বা আক্রমণাত্মক মনোভাব যদি মানবিকতার পরিপন্থী হয়, তবে বন্ধ হোক তার চর্চা সামগ্রিক সমাজ আচরণে। এই সদর্থক পরিবর্তনে সর্বাত্মক উদ্যোগ আজ জরুরি। তারও আগে সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে মানুষ গড়ার লক্ষ্যে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। তা না হলে মহাভারতের যুগ থেকে চলতে থাকা নারী নির্যাতনের ধারা, আধিপত্য আর নিপীড়নের ঐতিহ্য অব্যাহতই থাকবে। 'আমরা সভ্য জগতে ববাসের উপযোগী হয়ে উঠব কি না, তা প্রমাণের দায় আজ আমাদেরই'।

নিপীড়কের-ধর্ষকের নির্মম শাস্তির যে দাবি প্রবলভাবে উচ্চারিত হতে দেখি, সেই দাবির মধ্যেও আমাদের মনের ভিতরের প্রতিশোধকামী সেই হিংস্র, আগ্রাসী দিকটাই উঠে আসে। এখানেই সংশয় দেখা দেয়, সত্যিই আমরা কীসের নির্মূল চাইছি। অত্যাচারীর, নিপীড়কের? না, অত্যাচার আর নিপীড়নের। এ পর্যন্ত বহু অত্যাচারী নিপীড়ককেই আক্ষরিক অর্থে নির্মূল করা হয়েছে। তাতে অথ্যাচার-নিপীড়ন-ধর্ষণের মাত্রা কমেছে, এমন কোনও পরিসংখ্যান পাওয়া যায় নি। অত্যাচারী নিপীড়ককে হত্যা করা সহজ কাজ। কিন্তু অত্যাচার-নিপীড়ন-ধর্ষণ-যৌন হেনস্থা বন্ধ করতে প্রয়োজন সর্বাত্মক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, আন্তরিক উদ্যোগ, সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সংবেদন-সম্পন্ন চেতনার জাগরণ, যা খুব সহজ নয়। আমরা সত্যিই সভ্য জগতে বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠব কি না, তা প্রমাণের দায় আজ আমাদেরই। তা না হলে বদলাবে না কিছুই।

আজ লিঙ্গ সাম্যের সমাজ গড়ে তোলার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তা রূপায়নের দায়িত্ব আমাদের সবার। আমরা যদি লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে পারি, তাহলেই সম্ভব হবে নারীর ওপর যৌন হিংসার প্রকোপ কমানো।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, বিগত কয়েক বছরে দুর্নীতি যেন সমাজের একটি বড় অংশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। এর নাগপাশ থেকে বেরোনো ক্রমশ দুরূহ হয়ে উঠেছে। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের হত্যাকাণ্ডে সেখানকার কাঠামোগত দুর্নীতিতে ভরা ভয়াবহ ব্যবস্থার দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছে। এই দুর্নীতি শুধুমাত্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছে এর ভয়াবহ প্রকোপ।

সব দেখে, সব জেনেও যদি নীরব থাকি, তার জন্য আগামী প্রজন্মের কাছে আমরাও অপরাধী থেকে যাব। উমা

আমাদের কি কোনোদিন ঘুম ভাঙবে?

সুদেষ্ণা ঘোষ

আমাদের দেশ এ বছর ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস পালন করল। আমি বেশ কয়েক বছর ধরে স্বাধীনতা দিবস পালন করি না। দেশদ্রোহী বলতে পারেন। বেশ কয়েক বছর আগেও আমি সকলের মতো স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতাম। তবে যেদিন থেকে আমাদের স্কুলগুলি নাৎসি ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে, সেদিন থেকেই শিক্ষিকা হিসেবে আমি স্বাধীনতা হারিয়েছি—নাৎসি ডেথ ক্যাম্প নয়, এ হল নাৎসি ক্যাম্পে জীবন্মৃত অবস্থায় বসবাস করা। কাজেই আমার মতে আমি স্বাধীন ভারতে বাস করি না।

যে দেশের নামী হাসপাতালে আজও ৩১ বছরের একজন মহিলা ডাক্তারকে অকথ্য অত্যাচার করে, রেপ করে খুন করা হয়, সেই দেশ ৭৮ বছর আগে স্বাধীন হয়েছিল ভাবতেও অবাক লাগে। বিগত কিছুদিন ধরে টেলিভিশন, রেডিও, খবরের কাগজ, ফেসবুক, ইনস্ট্রাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি সব রকম সোশ্যাল মিডিয়ায় এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়ে চর্চা হচ্ছে। অনেক প্রশ্ন সকলের সামনে তুলে ধরা হল— দোষ কার, কেন মহিলাদের নিরাপত্তা নেই, সরকার কি করছে, বিরোধী পার্টিরা কি বলছে, হাসপাতালের প্রধান শিক্ষক (যিনি নাকি একজন ডাক্তার!) কতটা দায়ী ইত্যাদি ইত্যাদি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করছে। ঠিক যেমন হয়েছিল 'নির্ভয়া'র মৃত্যুতে ২০১২ সালে, সেই ছবি চোখের সামনে আবার ফুটে উঠছে। তফাৎ একটাই---খুব বড় তফাৎ। আজকের ঘটনা হাসপাতালের এক ডাক্তারের সঙ্গে ঘটেছে হাসপাতালের চত্বরের মধ্যে, যেখানে নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশি হওয়া উচিত।

যে দেশের নামী হাসপাতালে আজও ৩১ বছরের একজন মহিলা ডাক্তারকে অকথ্য অত্যাচার করে, রেপ করে খুন করা হয়, সেই দেশ ৭৮ বছর আগে স্বাধীন হয়েছিল ভাবতেও অবাক লাগে।

সারা কলকাতা ১৪ আগস্ট রাতে জেগে রইল। ১৯৭৭-এর মতো মহিলাদের নিরাপত্তার দাবি নিয়ে আবার হল 'রিক্লেইম দি নাইট' আন্দোলন। মহিলা-পুরুষ, বয়স্ক, শিশু নির্বিশেষে সবাই সামিল হল বিভিন্ন র‍্যালিতে। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছবিতে, ভিডিওতে ভরে গেল—সকলে লিখতে লাগল কি কি করেছে...ছবি পোস্ট করা হল, ধিক্কার দেওয়া হল। এই সব কিছুর মধ্যে আমি নির্বিকার। কোনো র‍্যালিতে বা মিছিলে যাই নি, কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে ধিক্কার জানাই নি। কিছুদিন চিন্তা, চেতনা এবং অনুভূতিহীন জড় পদার্থের মতো বসে রইলাম।

পাঠক হয়ত আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন—এত বড় নিন্দনীয় ঘটনার প্রতিবাদ করি নি কেন? সকল অপরাধীর নিজের পক্ষে কিছু বলার অধিকার থাকে, তাই আমার অনুরোধ, একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, আমার বক্তব্যের শেষে না হয় বিচার করবেন আমার অপরাধ কতখানি।

১৪ আগস্ট কলকাতার পথে-ঘাটে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন ঝড় উঠল, সে সময় আমার নিশ্চুপ থাকার কারণ খুবই গভীর। এর একটি ছোট কারণ বিশ্লেষণ করতে আমাদের ফিরে যেতে হবে স্কুলগুলিতে। বলা বাহুল্য আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা। না, ষাট বছরে পৌঁছতে দেরি আছে বেশ কয়েক বছর। চাকরিটা আগেই ছেড়ে দিলাম। এই চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কারণ এবং এই অত্যন্ত ঘৃণ্য, নিন্দনীয় ঘটনার কোথায় একটা যোগসূত্র আছে, যা পাঠককে জানাতে চাই।

প্রায় ২৮ বছর কয়েকটি পাঁচতারা স্কুলে পড়ানো অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে আজকের দিনে এসব স্কুলে জীবনের মূল্যবোধের আহুতি দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ ঠিকই পড়ছেন—যে মূল্যবোধ ভারতীয় সমাজের সব জাতির, সব ধর্মের একটি বড় অঙ্গ, পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং পুঁজিবাদী সমাজতন্ত্রের হাঁড়িকাঠে তার বলি হচ্ছে। যদিও স্কুলের উপর মহলের দাবি তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যবোধের পাঠ ছোটবেলা থেকেই পড়ান।

একটি ছবি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাই। ধরুন শিক্ষক বা শিক্ষিকা ভুল করেছেন। সে ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকা তাদের বকুনি দেবেন, এটাই স্বাভাবিক এবং হওয়া

উচিত। কিন্তু সে বকুনি ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উঁচু গলায় দেওয়া কি জরুরি? হয়ত না। কিন্তু এটা আজকাল নতুন নিয়ম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যদি দেখে যে তাদের টিচাররা বকুনি খাচ্ছেন, অপমানিত হচ্ছেন, তারা শিক্ষককে শ্রদ্ধা করবে কেন? ইংরেজিতে একটি কথা আছে transparency , তা একটা সীমা থাকা কি জরুরি নয়? আমাদের সমাজে এককালে 'গুরুশিষ্য পরম্পরা' কথাটি প্রচলিত ছিল। গুরু আর শিষ্যের মধ্যে যে শ্রদ্ধা-ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠত, সেটা আধুনিক জগতে বোধ করি অচল। আজকাল ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদের ভরসাও করে না, শ্রদ্ধাও করে না অর্থাৎ একে অপরকে শ্রদ্ধা করতে শেখা আর হয়ে ওঠে না। পাঠক হয়ত বলবেন যে, আজকাল আগেকার দিনের মতো ছাত্রদরদী, 'স্কুলের জন্য উৎসর্গিত' শিক্ষক শিক্ষিকা বিরল। ঠিকই। তাই বলে বড়রা ভুল করে থাকেন, তাই তাঁদের শ্রদ্ধা করার প্রয়োজন নেই, এই ভাবনা শিশু মনে গেঁথে দেওয়া কি ঠিক?

এবারে আসি অন্য একটা ছবিতে। ধরুন ছাত্র বা ছাত্রী কোনো অন্যায় করেছে, তাই তার বাবা-মাকে স্কুলে ডাকা হয়েছে। পাঠক হয়ত ভাবছেন— এরকম তো হয়েই থাকে। বহু যুগ ধরেই হয়ে এসেছে। তবে আজকাল স্কুলে এই ছোট্ট ঘটনা একটা হাইকোর্টের মামলার রূপ নেয়। শুধু শিক্ষকের কথার ওপর বিশ্বাস করে শাস্তি দেওয়া যায় না, কারণ শিক্ষকও তো মিথ্যা বলতে পারেন! তাই প্রমাণ বা সাক্ষ্য দরকার— তা অন্য ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্যও হতে পারে, সিসিটিভি ফুটেজও হতে পারে (আজকাল স্কুলে তাও পাওয়া যায়), সব দেখতে বা শুনতে চান অভিভাবক। কখনও কখনও অভিভাবকদের এ কথাও বলতে শুনেছি, 'চিন্তা করিস না, কিছুই হবে না, আমরা তো আছি। তাছাড়া আমাদের টাকায় তো স্কুল চলে, টিচারদের সংসার চলে।' সত্যিই তো! ছাত্র বা ছাত্রীরা দোষ শোধরানোর সুযোগ পায় না, বরঞ্চ নিজের দোষ অন্যের ওপর চাপাতে শেখে। স্কুলের এই ছোট চিত্র থেকেই বুঝে নিন আজকের সমাজের বড় চিত্র। অপরাধী যা খুশি করুক পেছনে 'আমরা' আছি। এই 'আমরা' খুব বড় ক্ষমতাবান গোষ্ঠী—এঁদের টাকা আছে, অস্ত্র আছে, হয়ত কোনো বড় রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদী হাত মাথায় আছে... এখানে বলে রাখা দরকার যে কোনো দলই এর ঊর্ধ্বে নয়, কারণ দলমত নির্বিশেষে মানুষ মূল্যবোধ হারিয়েছে। তাই আজও দিনের শেষে দেখতে হয় এক ৩১ বছরের মহিলা ডাক্তারের অত্যাচারিত নিথর দেহ।

সবশেষে আরেকটি ছোট্ট কথা বলি। আধুনিক সমাজে পুরুষ-নারীর সমান অধিকার—এ কথা প্রায়ই শোনা যায়। এ নিয়ে আলোচনা হয়, লেখালেখি হয়, আন্দোলন হয়। এখানেও আমরা অভিভাবকরা ভুল করি, কারণ পুত্র এবং কন্যা আমাদের সমাজে অনেকের বাড়িতে সমান অধিকার পায় না। সন্তানদের শিক্ষায় কোথাও একটা ফাঁক থেকেই যায়। ছোটবেলা থেকে ছেলেরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বড় হয়। মজার কথা যে, এই ভাবনা গড়ার পেছনে মায়েরা অনেক ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকেন। ছেলেরা অনেক সময় জোর খাটিয়ে অধিকার স্থাপন করতে শেখে, মেয়েরা মৌনভাবে হোক বা প্রতিবাদ করেই হোক শেষ পর্যন্ত সব কিছু মেনে নেয়। শুরু থেকেই যদি ছেলে-মেয়েকে লিঙ্গ নির্বিশেষে সমানভাবে বড় করা হয় তাহলে শহরের পথে পথে বিচার চাইতে আর হয়ত আমাদের মিছিল করতে হবে না।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় গোড়ায় গলদ। আমাদের স্কুলগুলি আজকাল বড় বড় ব্যবসা ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা খরিদ্দার, শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিক্রেতা। কাজেই খরিদ্দারের মন জুগিয়ে চলতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন। হঠাৎ মনে পড়ে গেল কবি শঙ্খ ঘোষের 'হামাগুড়ি' কবিতার একটি লাইন---'...কি খুঁজছেন? মিহি স্বরে বললেন তিনি মেরুদণ্ডখানা...' হয়ত সেই মেরুদণ্ড বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই শিক্ষিকার কাজটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কারণ আমার মনে হয়েছিল শিক্ষিকা হিসেবে। মানুষ হিসেবে আমি দায়িত্ব পালন করতে পারি নি।

পুঁজিবাদী সমাজতন্ত্রের ব্যবসায় স্কুলগুলির খুব বড় ভূমিকা। বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগেই রয়েছে। যেভাবেই হোক জেতার মানসিকতা তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনে। সহযোগিতা বড্ড সেকেলে। 'We reap what we sow'—আমরা যে বীজ বপন করছি সেরকম ফসলই তো পাব, তাই না?

মনুষ্য সমাজ উন্নতি সাধনের নামে এতটাই নীচে নেমে গেছে যে উপরের খোলা আকাশটা দেখাই দুষ্কর। তবু এত কলকাতাবাসী যে পথে নেমেছেন বিচার দাবি করতে, তা আশার আলো দেখায়। আমি এঁদের অভিনন্দন জানাই। আমি নমস্কার জানাই সেই যুবসমাজকে যারা এখনো বিশ্বাস হারায় নি। যারা সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে নিজেদের জীবন দিতেও প্রস্তুত। একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে অনেক তাজা প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে বহু দেশ। আমাদের কি কোনোদিন ঘুম ভাঙবে?

উমা

লক্ষ্মণরেখা

দীপাবলি সেন

লক্ষ্মণরেখা। অথবা আরো সহজ ভাষায়, গণ্ডি। এর বেষ্টনে অনেকেই আমরা থেকে থাকি। রামায়ণের 'রামরাজ্য' শব্দটির মতো, লক্ষ্মণরেখাও আমাদের বেশ পরিচিত একটা শব্দ, বরং নিকটতর, ঘনিষ্ঠতর একটি ধারণা যা প্রায়ই আমাদের ঘিরে থাকে। বিশেষ করে মেয়েদের যা দিয়ে ঘিরে রাখার চেষ্টা করা হয়। শব্দটি এতই প্রচলিত যে লক্ষ্মণরেখা/ লক্ষ্মণচক্কর (চক্র) বলে চখ-খড়ির মতো দেখতে একটি জিনিস বাজারে পাওয়া যায়, একটি আরশোলার ছবি সহ। টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে দেখানো হয়েছে দেরাজে আলমারিতে এটা দিয়ে দাগ কেটে দিলে আরশোলা ইঁদুর আর আসে না...বলে আমার আপনার মনের মধ্যেও এরকম একটা গণ্ডি টেনে দেওয়া হয় না? একটা বিপদসীমা? যা পার করলে নিজেরই বিপদ। যা অতিক্রান্ত হতে হয় নিজেরই দায়িত্বে?

আমার কিশোরীকালে প্রায়ই শুনতাম 'বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিস, ঠিক আছে, কিন্তু সন্ধ্যার আগেই ফিরতে হবে।' ১৯৭১-এর কোনো একটা বন্‌ধ-এর দিনে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম বলে মা-র একটি থাপ্পড়ও খেয়েছিলাম। অর্ধাধিক শতাব্দী পরে পরিস্থিতি কি খুব বদলেছে? অঞ্জলি সিং পয়লা জানুয়ারি ২০২৩-এ যখন পথে ১০-১২ কিলোমিটার ধর্ষিতা না হোক ঘর্ষিতা হন, শোনা কি যায় নি, তা মাঝরাতে অমন বেরোনোই বা কেন (যখন ২০ বছরের ওই মেয়েটি বেরিয়েছিল ফূর্তি করতে নয়, জীবিকার তাগিদে)? ৩৫ বছরের জেসিকা লাল এপ্রিল ২০, ১৯৯৯, সময়ের বাইরে মদ দিতে অস্বীকার করায় জনসমক্ষে সোজা নিশানায় খুন হয়ে যান, তখন ক্ষমতার উচ্চ শিখর থেকে শোনা গিয়েছিল, এ ধরনের চাকরি করলে এরকম তো হতেই পারে। এমনও অন্যত্র শুনেছি সেই নির্ভয়ার বা কি দরকার ছিল বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ঐ সিনেমাটি দেখতে যাবার! মেয়েদের বাড়াবাড়ি ভালো না...শিক্ষার ও সাফল্যের প্রতিমূর্তি সুধা মূর্তিকেও কিছুটা লড়াই করেই ছেলেদের সঙ্গে এক বিষয় পড়ার অনুমতি মিলেছিল। বাড়ি থেকে বলা ছিল, ক্লাসে কোনো ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। তা এই লক্ষ্মণরেখাটি তিনি প্রথম দু'বছর মেনেও ছিলেন। কল্পনা চাওলা সম্বন্ধেও লোককে বলতে শুনেছি, একেবারে মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে চলে গেল যে মেয়ে, তার তো অমন মৃত্যুই হবে। ঘরের মেয়ে বা ঘরের বৌ হয়ে থাকলে নিশ্চয় তিনি এখনও আমাদের মধ্যেই থাকতেন।

কিছুদিন আগে দিল্লির বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠানে বেসমেন্টের বায়োমেট্রিক লক্ আটকে গিয়ে জলে ডুবে মারা গেল একটি তরুণ ও দুটি তরুণী। কেউ কি আর বলছেন না যে তারা সরকারি পদের মোহে ঐ ভূগর্ভে গিয়ে পড়ল কেন!

এই সতর্ক রেখাটি টানা সর্বত্র। আমাদের নিজেদের পরিবার পরিজনের মধ্যেই দেখবেন, অনেক উদাহরণ পাবেন।

চীন দেশে মেয়েদের পা বেঁধে দেবার থেকেও ভয়ঙ্কর এই বাঁধন। কারণ এটা মনের ওপর—খোলা আরো কঠিন।

'রেখা' শব্দটি উইকিপেডিয়াতে স্থান করে নিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের একটি বয়ানেও এটির ব্যবহার হয়েছে, বিচারক বি ভি নাগতীর্থ দ্বারা (এক্সপ্রেস নিউজ সার্ভিস অ্যাক্ট, অক্টোবর ১৩, ২০২২)।

আমার এ লেখার বক্তব্য হল, মূল রামায়ণে অর্থাৎ বাল্মীকি রামায়ণে লক্ষ্মণরেখা বলে কিছু নেই—দীনেশ সোনি উদ্ধৃতি সহকারে এটা দেখিয়েছেন (৮ মার্চ, ২০২৪)

তত: তু সীতাম অভিবাদ্য লক্ষ্মণ:
কৃত অঞ্জলি; কিঞ্চিৎ অভিপ্রণম্য
অবেক্ষমাণো বহুশ: স মৈথিলীম
জগাম রামস্য সমীপম আত্মবান। (অরণ্য কাণ্ড ৩-৪৫-৪০)

সীতার কাছে কিঞ্চিৎ ধমক-ধামক খেয়ে লক্ষ্মণ যে বেরোলেন তা তাঁর বৌদির জন্য কোনো গণ্ডি টেনে দিয়ে নয়। বনের দেবদেবীর প্রতি সীতাকে দেখবার অনুরোধ জানিয়ে, বারবার একলা দাঁড়িয়ে থাকা সীতার দিকে ফিরে তাকাতে তাকাতে তিনি যান। তবে কি আছে তুলসীদাস রামায়ণে? না তাতেও তো নেই, অবশ্য রঙ্গনাথ রামায়ণ অর্থাৎ তেলেগু রামায়ণে (১৩০০-১৩১০ সিই/CE তে রচিত) আছে যে লক্ষ্মণ পাতার সেই কুটিরের চারদিকে একটি রেখা টেনে দিয়ে বলেন, যে কেউ ওটি লঙ্ঘন করার দুঃসাহস করবে

তার মস্তক সহস্র খণ্ডে চূর্ণ হয়ে মাটিতে পড়বে।

আর আছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে। কিন্তু কিভাবে দেখুন বইয়ের ১৯৪ পাতায়—

লক্ষ্মণ ধার্মিক অতি মনে নাহি পাপ।
সকলেরে সাক্ষী করে পেয়ে মনস্তাপ।
জলচর স্থলচর অন্তরীক্ষচর
সবে সাক্ষী হও সীতা বলে দুরক্ষর
প্রবোধ না মানে সীতা আরো বলে রোষে।
আজি মজিবেক সীতা আপনার দোষে।
গণ্ডি দিয়া বেড়িলেন লক্ষ্মণ সে ঘর
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর
স্বয়ং বিষ্ণু রঘুনাথ তাঁর পত্নী সীতা
শূন্য ঘরে রাখি ও হে সকল দেবতা।
আমারে বিদায় দাও সীতা ঠাকুরানি!
আর কিছু বলিও না দুরক্ষর বাণী।

সীতা কিন্তু মনের ভুলে গণ্ডির বাইরে পা রাখেন নি...তাঁর যুক্তি বা চিন্তাটি ছিল—

জানকী বলেন দ্বিজ! করি নিবেদন।
পঞ্চ ফল ঘরে আছে কারাহা ভক্ষণ।
রাবণ বলিল, সীতা! ব্রত করি বনে
আশ্রমে না লব ভিক্ষা জ্ঞানে মুনিগণে।
জানকী বলেন, দ্বিজ! এক কথা কহি।
প্রভু আজ্ঞা বিনা ঘরের বাহির নহি।
জানকী বলেন ব্যর্থ অতিথি যাইবে।
ধর্ম কর্মা নষ্ট হবে প্রভু কি বলিবে?
বিধির নির্বন্ধ কভু না হয় অন্যথা
বিধির লিখন মত ঘটিবেক তথা।
ফল হাতে বাহির হইলেন জানকী।
লইতে আসিল দুষ্ট রাবণ পাতকী।
ধরিয়া সীতার হাত লইল ত্বরিত।
জানকী বলেন, হায় এ কি বিপরীত?

কৃত্তিবাসের ১৬১ পাতায় এই যে সীতাকে আমরা পাই, তাঁর মনে ইতিমধ্যেই কিছু দাগ পড়ে গেছে। অতিথি নারায়ণ, পতি পরমদেবতা, বিধির বিধান কে ঠেকাতে পারে ধরনের। এই দাগ কিন্তু বেচারা লক্ষ্মণের টানা নয়। বাল্মীকি থেকে কৃত্তিবাসের কালের যে ব্যবধান, এ তারই ছোপ। ত্রেতা থেকে কলিযুগ আসার পদচিহ্ন।

কিন্তু এই দাগ বাঙালির মনে গেঁথে গেল কি করে? তার একটা কারণ হতে পারে এই যে এটি সেরামপুরে/শ্রীরামপুরের মিশন প্রেসে ছাপা হয় ১৮০৩-এ। বাংলা নিউ টেস্টামেন্ট যেখানে ছাপা হয় ১৮০০-তে। (জয়গোপাল তর্কালঙ্কার-এর পরিশোধিত সংস্করণটি বেরোয় ১৮৩৪-এ, তার খুব দেরিতে নয়।)

এর প্রসার বাঙালির কাছে সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণের থেকে অনেক বেশি। দীনেশচন্দ্র সেন এটিকে বাঙালির বাইবেল বলে গেছেন, এমনই প্রচার, প্রসার ও প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের মনে ছবি ছিল দিদিমা বসে এটি পড়ছেন। পরিচারক শিশু রবিকে এক জায়গায় বসিয়ে রাখার জন্য গণ্ডি কেটে দিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু উত্তর ভারতে তো লক্ষ্মণরেখার ধারণাটি কৃত্তিবাস বা রঙ্গনাথ থেকে পৌঁছতে পারে না। সাহিত্য সমাজতত্ত্ব ইতিহাসের পণ্ডিতেরা বলুন এই নিয়ে। আমি এখানে শুধু বলছি এই: প্রধানত প্রশাসনিক-রাজনৈতিক প্রোৎসাহনে আজকাল প্রাচীন ধ্যানধারণার যে জোয়ার আসছে বলে মনে হচ্ছে, তাতে ভেসে যাওয়ার আগে, একটু দেখে নিন সেগুলো সেখানে আছে কিনা। লক্ষ্মণরেখা তথাকথিত সনাতন ধর্ম বা শাস্ত্র বিধির অংশ নয়। ঋষি বাল্মীকি ওরকম কোনো কথা বলে যান নি। যাঁরা নতুন উৎসাহে সনাতনী হতে চান, তাঁদেরও বলি, তাঁদের বিশেষ করে বলি—বাল্মীকি রামায়ণটা একবার খুলে দেখুন।

উমা

চতুর্দশ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

আগামী ২৩ নভেম্বর ২০২৪ উৎস মানুষ-এর প্রয়াত সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে একটি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। বক্তৃতার শিরোনাম—'*চোপ্ উন্নয়ন চলছে*'। আমন্ত্রিত বক্তা অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বিশ্বাস। কলেজ স্কোয়ারে বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মহাবোধি সোসাইটির সভাঘরে বিকেল ৫টায় অনুষ্ঠান শুরু হবে। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

আহরণ

শাঁখা-সিঁদূর-ঘোমটা

শান্তিসুধা ঘোষ

শান্তিসুধা ঘোষ (২৭ জুন ১৯০৭-৭ মে ১৯৯২) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ব্যক্তিত্ব।

অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃভূমি ছিল বরিশালের গাভা গ্রামে। পিতার নাম ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ও মাতার নাম অন্নদাসুন্দরী ঘোষ। অঙ্কবিদ ও আইনজীবী দেবপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ১৯২৪ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হন। আই এ পরীক্ষাতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন এই মেধাবী ছাত্রী। অঙ্কে অনার্স নিয়ে ১৯২৮ সালে বি এ পাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে মিশ্র-গণিত নিয়ে এম এ পড়েন। ঈশান স্কলার হয়েছিলেন। একজন বিপ্লবী সহযোগী হয়ে ওঠেন। সতীন সেনের তরুণ সংঘ (ইয়ুথ ক্লাব) অনুসরণ করে তিনি বরিশালে শক্তিবাহিনী (১৯৩০) নামে একটি মহিলা ক্লাব গঠন করেন যাতে তাদের বিপ্লবের জন্য একটি সম্পূরক শক্তি হিসাবে প্রস্তুত করা যায়। এসবই তাঁকে পুলিশের নজরদারিতে নিয়ে এসেছিল। ১৯৩৪ সালে শান্তিসুধাকে কলকাতায় গ্রেপ্তার করে বরিশালে বন্দী করা হয়। ১৯৩৭ সালে স্বাস্থ্যগত কারণে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ১৯৪২-৪৩-এ তাঁকে আবার কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। মুক্তির পর তিনি দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কাজে যোগ দেন। ১৯৪৭-এ পাকাপাকিভাবে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। প্রথমে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে পরে কলকাতার ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে অধ্যাপনা শুরু করেন। হুগলি উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষ হন, সেখান থেকেই থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

ওঁর লেখা বই— গোলকধাঁধা, ১৯৩০ (উপন্যাস), নারী, জীবনের রঙ্গমঞ্চে (আত্মজীবনী)।

শান্তিসুধার জেলখানার স্মৃতিকথা ইউটিউবে পাওয়া যায়।

বধু যখন মস্তকে অবগুণ্ঠন টানিয়া সীমন্তে ও ললাটে সিঁদূর আঁকিয়া সলজ্জবেশে দাঁড়ায়, দেখিতে বেশ লাগে। হাতের শঙ্খচিহ্ন সহসা চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু বধু জানে, ওটি তাহার না হইলেই নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়। তিনটি সজ্জাভরণে মিলিয়া তাহার দেহে ও মনে যেন অনির্ব্বচনীয়, অপরেও বলে তাই। বোধ হয় এইজন্যই আধুনিকাগণ পুরাতন সামাজিক রীতিনীতি অনেক পরিমাণে সংস্কার করিয়া চলিলেও ও তিনটিকে এখনও পরিহার করিতে পারেন নাই। অবগুণ্ঠন আজকাল কমিয়া আসিয়াছে, পর্দ্দাপ্রথার উচ্ছেদের সাথে সাথে উহারও দৈর্ঘ্য কমিতে কমিতে খোঁপার উপরিভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়াছে, তথাপি একেবারে স্খলিত হইতে সাহসী হয় নাই। শাঁখাও অন্যান্য আভরণের সঙ্গে অঙ্গের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, তবে অনেকে উহাকে আগের মত আর অপরিহার্য্য মনে করেন না। কিন্তু সর্ব্বজয়ী হইয়া বিরাজ করে সিঁদূর, উহার মায়া কাটাইবার মত যথেষ্ট উৎসাহ কাহারও মধ্যে দেখিতে পাইনা। এমন কি, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া স্বতন্ত্রসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন, সেই ব্রাহ্মিকাগণও হিন্দুর সিন্দুরবিন্দু সগৌরবে সীমন্তে ধারণ করিয়া থাকেন, এবং ততোধিক আশ্চর্য্য, বাঙ্গালী খৃষ্টান মহিলাগণকেও, এবং দুই একটি মুসলমান মহিলাকেও, কোনও কোনও স্থলে সিঁদূর পরিতে দেখিয়াছি।

স্বভাবের একটি দোষ আছে, কোনও বিষয়কেই ভাসা-ভাসা বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি না, একেবারে মূল পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিতে কৌতূহল জাগে। তাই শাঁখা-সিঁদূর-প্রথাগুলিকে লইয়াও অনেক সময় অনেক কথা ভাবি, হয়তো বা সেগুলি অবান্তর। কিন্তু বাস্তবিক কেহ বলিতে পারেন কি, বিবাহিতজীবনে শাঁখা-সিঁদূর-ঘোমটার সম্বন্ধে মেয়েদের এই মায়া ও সমাজের এই অনুশাসন কেন? স্বীকার করি, এগুলি দেখিতে সুন্দর লাগে এবং সেইজন্যই বোধহয় ব্রাহ্ম খৃষ্টানগণও সামাজিক নির্দ্দেশ না থাকা সত্ত্বেও এগুলি গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন। কিন্তু এই যে সৌন্দর্য্য, এ সৌন্দর্য্য কি চোখের, না মনের? একজন অনবগুণ্ঠিতা শুভ্রভাল সুন্দরী কুমারীকে দেখিতে যতখানি ভালো লাগে, সহসা সীমন্তে রক্তরেখা ও মস্তকে অবগুণ্ঠন ধারণ করিলেই তাহার রূপ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিবে কেন, বুঝিতে পারি না। যদিই বা তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া

লই, তবে সে সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি কুমারীকালে করিলেই বা দোষ কি? কারণ, কুমারীকালে কপালে লাল পরিবার রীতি আছে, এবং ব্রাহ্মিকা, খৃষ্টান ও মুসলমান মহিলাগণ কুমারীকালেও বয়স্থা হইলেই মাথায় অবগুণ্ঠন রক্ষা করেন। সুতরাং বিবাহ হওয়ামাত্রই এগুলি এক অভিনব রূপ ধারণ করে, অন্যথা করে না, ইহার কোনও অর্থ হয় না। বধুবেশে এগুলিকে আমরা যে অনির্ব্বচনীয় শ্রী বলিয়া মনে করি, ইহা আমাদের মনের সংস্কার। জন্ম হইতে চারিদিকে এ ব্যবস্থা দেখিতে দেখিতে এবং পুঁথিপুরাণে কাব্যগ্রন্থে বর্ণনা পড়িতে পড়িতে কল্পনা করিতে অসুন্দর মনে হয়। পতির প্রতি নারীহৃদয়ের সমস্ত প্রেমকে, নারীর সমস্ত কল্যাণমূর্ত্তিকে, আমরা এই নিদর্শনগুলির মধ্যে যেন কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছি। তাই এগুলি না হইলে হিন্দুনারীর চলে না। মুখে স্বীকার করুন আর নাই করুন, শিক্ষিতাদেরও মনের মধ্যে আজন্মপুষ্ট এই সংস্কার এমন ভাবে বাসা বাঁধিয়া আছে যে, এগুলির, বিশেষতঃ সিঁদূরের অদর্শন ঘটিলে মনের কোণে অলক্ষিতে সাড়া পড়ে। এ সংস্কার যদি তাঁহাদের না থাকিত তাহা হইলে বহুপূর্ব্বেই অন্যান্য আবর্জ্জনার মত এ প্রথাও দূরীকৃত হইয়া যাইত, সন্দেহ নাই।

আমি শাঁখা-সিঁদূর-ঘোম্‌টা বর্জ্জন করিবার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনও কিছুই বলিতে চাহি না। কারণ এগুলি শুধুই বাহিরের সৌষ্ঠব, মেয়েদের আর পাঁচটা সাজসজ্জার সঙ্গে আরও গুটিকয়েক মাত্র, সুতরাং থাকিলেও ক্ষতি নাই, না থাকিলেও না। কিন্তু ভাবিবার কথা এই যে, স্বামিলাভের নিদর্শনস্বরূপ কতগুলি চিহ্ন সতত অঙ্গে ধারণ করা নারীজীবনের জন্য বিহিত হইল কেন? এই ব্যবস্থা শুধু যে আমাদের সমাজেই, তাহা নয়, পৃথিবীর বহু সভ্য ও অসভ্য সমাজেও বিভিন্নরূপে বর্ত্তমান ছিল এবং আছে জানি। তবে স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে হিন্দুসমাজে সর্ব্ববিষয়েই কৃত্রিম পার্থক্য টানা ও বৈষম্যের ব্যবস্থা করার যে অতিরিক্ত প্রবণতা, তদনুসারে এ বিষয়েও তাহাদেরই বাড়াবাড়ি একটু বেশী। —অবিবাহিত জীবনের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের একটি বিশেষ পার্থক্য আছে, এবং সেই পার্থক্য সূচিত করিবার জন্য আচারে ব্যবহারে, অথবা বাহ্যিক বেশভূষায় যদি কোনও বিশিষ্টতা আরোপ করা হয়, তাহাতে কোনই আপত্তির কারণ নাই; বরং কোনও কোনও দিক্ দিয়া দম্পতীর পক্ষে এরূপ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়ও বটে। দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করিবার অভিলাষ লইয়া দুইটি নরনারী যেমন বিবাহ নামক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া সমাজের সম্মতি গ্রহণ করিয়া লয়, তেমনই সেই জীবন যতকাল স্থায়ী হয়, ততকাল তাহার স্থায়িত্ব সমাজের কাছে ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে কোনরূপ বিশেষ আচরণপদ্ধতি বা বাহ্যিক বেশভূষা মানিয়া লওয়া মন্দ নয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠে এই যে, এ বিষয়ে একতরফা বিচার কেন? নারীর পক্ষে স্বামিপ্রাপ্তি ঘোষণার জন্য এত জাঁকজমক্, অথচ পুরুষের পক্ষে বিবাহস্বীকার করিবার মত বহিরাচরণের কোনই বালাই নাই, এ কেমন কথা? পত্নী যেমন সিঁদূর পরেন, পতিও তেমনই সর্ব্বদা তিলক ধারণ করিতে পারেন, পত্নীর পক্ষে অবগুণ্ঠন যেমন বাধ্যতামূলক হইতে পারিত (অবগুণ্ঠনের প্রস্তাব না হয় নাই করিলাম), কুমারী মেয়ে যেমন শাঁখা বা লোহা (দেশবিভেদে) পরেন না এবং বিবাহিত হইলে অবশ্যই পরেন, পুরুষের পক্ষেও তেমনই বিধান হইতে পারিত—অবিবাহিতেরা অঙ্গুরী পরিবেন না, বিবাহিতেরা অপরিহার্য্যরূপে পরিবেন, অথবা এমনই যা হউক একটা কিছু। অর্থাৎ সমাজ-ব্যবস্থাপকদিগের ইচ্ছা থাকিলে এরূপ যে কোনও কিছু বিবাহপরিচায়ক নিদর্শন পুরুষের পক্ষে বিধান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা করেন না। শাঁখা-সিঁদূরাদির ব্যবস্থা যদি পত্নীর স্বামিপ্রেমের প্রতীকরূপে করা হইয়া থাকে, তবে স্বামীর পত্নীপ্রেমের প্রতীকরূপে একটা কিছু নিদর্শন ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকাও সমানই উচিত ছিল। অন্যথা বুঝিতে হইবে, পতিপ্রেমকে নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া সাব্যস্ত করা হইলেও পতির পক্ষে পত্নীকে ভালোবাসার কোনও প্রয়োজন বা দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে করা হয় নাই। মেয়েদের পক্ষে শাঁখা-সিঁদূরের ঘটা ও পুরুষের বেলায় সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অব্যাহতি ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। দেখিয়া শুনিয়া একমাত্র সিদ্ধান্ত এই হয় যে, মেয়েদের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে বিবাহগত করিয়া রাখাই আমাদের সমাজকর্ত্তৃগণের উদ্দেশ্য ছিল, এবং পক্ষান্তরে, বিবাহের সুখ সমানই ভাবে উপভোগ করা সত্ত্বেও পুরুষেরা বিবাহকে নিজেদের জীবনের একমাত্র কেন, মুখ্য ব্যাপার বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের গতিবিধির ব্যবস্থা যথাসম্ভব মানুষ হিসাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু নারীর জীবনকে মনুষ্যত্বের অখণ্ড কল্পনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিবাহিত জীবনেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ ও খণ্ডিত করিয়া রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা হইয়াছে। (এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্য করা অবান্তর হইবে না যে, আমাদের সমাজে নারীর শুধু নারীরূপে কোনও স্থান নাই, সে হয় কুমারী, নয় সধবা, নয় বিধবা, অর্থাৎ বিবাহহিসাবেই তাহার জীবনের বিভাগ ও ব্যবস্থা নির্দ্দেশ)।

এই জন্যই শাঁখা, সিঁদূর, অবগুণ্ঠন ইত্যাদি অশেষ প্রকারের নিদর্শন দ্বারা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাকে বিবাহিত জীবন স্মরণ করাইয়া দিবার সূক্ষ্ম কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে। পতির জীবনের অনুসারেই তাহার সমগ্র জীবন—এই ভাবটি নারীর মনের উপরে দুরপনেয়ভাবে বিস্তার করিতে ইহা বাস্তবিকই একটি অপরূপ মায়াজাল, স্বীকার না করিয়া সাধ্য নাই। কুমারী দেখে, পতিকে বরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জীবনের আচার-ব্যবহার এমন কি বাহিরের রূপ পর্য্যন্ত বদ্‌লাইয়া যায়, আবার অপর দিকে মর্ম্মাহত নেত্রে বিধবাও দেখে তাহাই। একই নারী—কুমারীকালে, পতিলাভ করিবার পরে, ও পতিকে হারাইবার পরে—ত্রিবিধ অবস্থায়, অশনে বসনে ভূষণে আচারে বিচারে তিনটি বিভিন্ন মানুষ হইয়া দাঁড়ায়। পতিদেবতার কি আশ্চর্য্য মহিমা। অথচ একটি পুরুষকে বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত কোনকালে কোনদিক দিয়াই ধরিবার সাধ্য নাই, সে বিবাহিত কি অবিবাহিত, সপত্নীক কি বিপত্নীক। অর্থাৎ বিবাহিত জীবন লইয়া সে মাথা ঘামায় না। নারীমনকে স্বতন্ত্র মনুষ্যত্ব বিস্মরণ করাইয়া পতিসর্ব্বস্ব করিয়া রাখিবার জন্যই প্রদানতঃ শাঁখা-সিঁদূরাদি প্রথার প্রবল প্রভাবের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল।

কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও একটি কারণ মূলে আছে। বিবাহমাত্রই হিন্দুনারী স্বামীর সম্পত্তি হইয়া পড়িল ('স্বামী' শব্দটির ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করিবেন), বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণে রহিলেও তাঁহাদের ঠিক সম্পত্তি নয়, অর্থাৎ অবিবাহিত কালে অপর যে কোনও পুরুষ তাহার প্রতি লোভ করিতে অধিকারী, এমন কি, নিতান্ত লোভ সংবরণ করিতে না পারিলে অভিভাবকের সম্মতির বিরুদ্ধে তাহাকে চুরি করিয়া আত্মসাৎ করিলেও হিন্দশাস্ত্রানুসারে অসিদ্ধ হয় না। কিন্তু বিবাহ হইলেই সে গুড়ে বালি পড়ে, আর তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিবার অধিকার নাই, কারণ সে এখন অপরের সম্পত্তি। কুমারী বালিকা সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারগণের কড়াকড়ি না থাকিলেও পরস্ত্রীসম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি (নহিলে পুরুষেরই বিপদ ঘটে।), কাজেই কে কুমারী এবং কে সধবা, ইহার অতি পরিস্ফুট পরিচয় নারীর সর্ব্বাঙ্গে না থাকিলে পুরুষের পক্ষে অসুবিধায় পড়িবার সম্ভাবনা—অর্থাৎ লোলুপ হইবার অধিকার আছে কিনা, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং শাঁখা-সিঁদূর প্রভৃতি ট্রেড্‌মার্কের প্রয়োজন একান্তহ হইল। পুরুষের পক্ষে এরূপ ট্রেড্‌মার্কের প্রয়োজন ছিল না, কারণ বিবাহিত পুরুষ পত্নীর সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কোনও কুমারী কন্যা কোনও পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হইলে জানিবার দরকারই নাই, সে পুরুষ বিবাহিত কি অবিবাহিত, যেহেতু হিন্দুসমাজে পুরুষের বহু বিবাহের অবাধ অধিকার আছে, সুতরাং মাল্যদান করিলেই হইল। আর, বিবাহিতা নারীর পক্ষে তো অপর কোনও পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার প্রশ্নই উঠিতে পারে না, কেন না, সে পরপুরুষের পানে চাহিবারই অধিকারী নয়, আকর্ষণ বিকর্ষণ তো দূরের কথা।

অবগুণ্ঠন সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আর একটু কথা বলি। অবগুণ্ঠন হিন্দুসমাজে বিবাহিতারাই ধারণ করেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম খৃষ্টান ও মুসলমান অবিবাহিতা অবস্থাতেই একটু বয়স্থা হইলে ধারণ করেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহাতে বুঝা যায়, ইহা পত্নীত্বের বিজ্ঞাপন ততটা নয়, যতটা যৌবনের বিজ্ঞাপন এবং পুরুষের দৃষ্টি হইতে নিজের বদনকমল অন্তরাল করার প্রচেষ্টা। সকলেই জানি, পর্দ্দাপ্রথার মূলে এই কারণই বর্ত্তমান। কিন্তু আজকাল সে অন্তরালকারী অবগুণ্ঠন মেয়েদের মুখে বড় একটা দৃষ্ট হয়না (যে সব মুসলমান নারী 'বোর্‌খা' পরিধান করিয়া থাকেন তাঁহাদের কথা বাদ দিতেছি), এখন উহা শুধু একটু আনুষ্ঠানিক চিহ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুতরাং উহাতে এখন ভাবের তাৎপর্য্য ছাড়া কাজের তাৎপর্য্য কিছুই নাই। আর ভাবের দিক্ হইতে ভাবিতে গেলেও সম্মানজনক কিছু দেখিতে পাই না, পরন্তু পুরুষের পক্ষে ইহাতে অসম্মানের যথেষ্ট কারণ আছে। কেন না, অবগুণ্ঠন প্রথার মূলে পুরুষের চক্ষু হইতে লুকাইবার যে প্রয়াস নিহিত আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, যে সমাজের পুরুষগণ যত বেশী অসংযত সেই সমাজেই পর্দ্দাপ্রথার প্রয়োজন তত অধিক এবং ঘোম্‌টা প্রথাটি সেই বর্ব্বরোচিত সমাজেরই স্মৃতিখানি বজায় রাখিবার সহায়তা করিতেছে মাত্র।

সামান্য শাঁখা-সিঁদূর-ঘোমটা অবলম্বনে অনেকগুলি কথা বলিয়া ফেলিলাম। কিন্তু চিহ্নগুলি সামান্য হইলেই ইহার পশ্চাতে এত গভীর কার্য্য-কারণ-সূত্র রহিয়াছে এবং আমাদের সমাজে এমন ব্যাপকভাবে অলক্ষ্য প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে যে, প্রত্যেক শিক্ষিত নর-নারীরই এ সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত। যে সকল আচরণ আচরণহিসাবে নগণ্য, অথচ কার্য্য-কারণ-নির্ণয়ে অসভ্য-সমাজোচিত এবং পক্ষপাতদুষ্ট, তাহাকে কেবলমাত্র পুরাতন রীতির মোহবশে মানিয়া লওয়ার সার্থকতা কতটুকু, তাহা ভাবিবার বিষয়।

উমা

দেশীয় প্রযুক্তির পুনরুজ্জীবন

রূপালী গঙ্গোপাধ্যায়

প্রযুক্তি কাকে বলে? কোথা থেকে মানুষের প্রযুক্তি অভিযান শুরু হয়েছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়েছি ছোটবেলায় পড়া একটা প্রবন্ধে যার শিরোনাম হল 'মানব জাতির কল্যাণে প্রযুক্তি' (Technology for Mankind); লেখক : জ্যাকব ব্রোনোস্কি। আদিম মানুষের রোজকার দরকারগুলো মেটাবার জন্য কিভাবে নানারকম প্রয়োগ কৌশলের জন্ম হয়েছিল যাদের সাহায্যে বেঁচে থাকার লড়াইটা একটু একটু করে সহজ হয়ে উঠেছিল, সে কথা এখানে বোঝানো আছে। আগুন জ্বালানো থেকে শুরু করে কাঠ-পাথরের অস্ত্র তৈরি এবং অবশেষে চাকা আবিষ্কার, সবই এই সব কৌশলের মধ্যে পড়ে। এভাবেই ধীরে ধীরে মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে আর সভ্যতা আস্তে আস্তে এগিয়েছে। পরবর্তীকালে মানব সভ্যতা যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়লেও সেই প্রাচীন প্রয়োগকৌশলগুলোর অনেক কিছু কিন্তু আজও বেঁচে আছে, যাকে আমরা দেশীয় প্রযুক্তি বলে থাকি।

দেশীয় প্রযুক্তি বিষয়টা এই বছর আবার নতুনভাবে আলোচনায় উঠে এসেছে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বিজ্ঞান দিবস (২৮ ফেব্রুয়ারি) পালনের নতুন থিম ঘোষণা হয়েছে 'বিকশিত ভারতের জন্য দেশীয় প্রযুক্তি' (Indigenous Technologies for Vikshit Bharat)। এই থিমের ওপরে সারাবছর ধরেই নানারকম আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। হচ্ছেও। কিন্তু দেশীয় প্রযুক্তি বিষয়টির তাৎপর্য শাসকদল তাঁদের পছন্দমত বদলে নিয়েছেন, যে কারণে বিজ্ঞান দিবসের কার্যক্রম সেই প্রাক্-নির্বাচন পর্বে স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক অভিসন্ধিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কারণ এই থিম ঘোষণার সময় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং দেশীয় প্রযুক্তি এবং দেশীয় বিজ্ঞানীদের অবদানের প্রতি জনগণের প্রশংসাসূচক মনোভাব তৈরি করার কথাও গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন। নির্বাচন পরবর্তী পর্যায়ে সেই উৎসাহে কিছুটা ভাঁটা পড়লেও ভুলটা সংশোধন করে নেওয়া খুবই জরুরি। কারণ সদ্য হাতে পাওয়া এই বিষয়টি নিয়ে এবং বিজ্ঞান দিবস পালনের সঙ্গে তার সঙ্গতি নিয়ে কিন্তু সদর্থক চিন্তাভাবনার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

বিজ্ঞান দিবস হল বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তোলার দিন; যুক্তিহীন, ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা জারি রাখার দিন। তেমনি থিম হল এমন বিন্দু, যাকে কেন্দ্র করে মূল বিষয়টি নানাদিকে প্রসারিত হতে পারে। অর্থাৎ 'থিম' এমন হবে, যা মূল বিষয়টিকে ঘিরে নানারকম ভাবনা ও বিশ্লেষণকে উৎসাহিত করবে, শুধুমাত্র কিছু তথ্যকে তুলে ধরবে না। বিজ্ঞান দিবসের প্রথম দিকের থিমের দিকে তাকালে এই বিষয়টা স্পষ্ট বোঝা যায়। গত কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞান দিবস পালনের প্রবণতা যতটা বেড়েছে, থিম মুখ্য উদ্দেশ্য থেকে ততটাই বিচ্যুত হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরে বিজ্ঞান চেতনাকে গড়ে তোলার পরিবর্তে বিজ্ঞানকে কোনো না কোনো একটা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে; নানাভাবে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে শুধু প্রযুক্তির জয়গান গাওয়াও হয়েছে। বিজ্ঞান দিবস পালনের এই রীতিনীতি যে বর্তমান সরকারের বিজ্ঞান ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একথা আগেও বারবার আলোচনা হয়েছে।

তবে 'বিক্‌শিত'টুকু বাদ দিলে চর্চার জন্য দেশীয় প্রযুক্তির মতো একটি বিষয়ের ভাবনাটা বেশ প্রশংসনীয়। তবে তার জন্য জানা দরকার দেশীয় প্রযুক্তি বলতে সত্যিই কি বোঝায়। মন্ত্রীমশাই যদিও দেশীয় প্রযুক্তি মানে একেবারে (বর্তমান সরকারের) সমকালীন প্রযুক্তি অর্থাৎ চন্দ্রযান, আদিত্য এল-ওয়ান, কোভিডের টিকা ইত্যাদির কথাই উল্লেখ করেছেন; কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে দেশীয় প্রযুক্তি মানে 'দেশের লোকের উপকারের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার' নয়। বরং প্রাচীনকাল থেকে দেশীয় মানুষজনের হাতে স্থানীয় উপকরণ কাজে লাগিয়ে যেসব 'ঘরোয়া' পদ্ধতিতে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে তারই উত্তরাধিকার। সঠিক অর্থে দেশীয় প্রযুক্তি মানে তা অবশ্যই প্রজন্মব্যাপী 'ঘরোয়া' ব্যবহারিক জ্ঞান ও বিদ্যার ধারা যা এখনো প্রাসঙ্গিক। স্বাভাবতই স্থানভেদে এই প্রযুক্তির নানা রকমভেদ দেখা যায় অর্থাৎ একই কাজের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে এমনকি একই দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিচিত্ররকম প্রযুক্তি কৌশল ব্যবহার হয় যার প্রত্যেকটির পেছনেই আছে স্থানীয় মানুষের গভীর পর্যবেক্ষণ ও দক্ষতা। যেমন বহু প্রজন্ম ধরে পৃথিবীর অনেক দেশেই মাটির পাত্র

তৈরি হয় কুমোরের চাকা থেকে; মাটির মেঝে বা দেওয়ালকে মসৃণ এবং জীবাণুরোধক করে তুলতে মাটির সঙ্গে গোবর বা অন্য কিছু মিশিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। কিরকম পাত্র তৈরি হবে বা কি মেশানো হবে তা স্থানভেদে বদলায়, কিন্তু মৌলিক ধারণাটা বদলায় না। তেমনি আমাদের দেশে লঙ্কা বা টমাটোর ক্ষেতে জীবাণু আক্রমণ আটকাতে মাঝে মাঝে গাঁদাফুলের চাষ করা হয়। শিশুর মাথার গড়ন সুন্দর করতে সর্ষের (চাল-ডাল নয়!) বালিশ ব্যবহার করা হয়। মিশ্র চাষে যে জীবাণুর আক্রমণ রোধ করা যায় বা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ (৫০০ গ্রাম-১ কিলো) সর্ষের তৈরি একটি নরম বালিশে যে সর্ষের বহতা ধর্ম (ফ্লুইডিটি) দেখা যায় এই পর্যবেক্ষণটাই হল ঘরোয়া প্রযুক্তির মূল, যা এখনো প্রাসঙ্গিক।

ভারতীয় জ্ঞানধারার (ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম) প্রবক্তারা যে দেশীয় প্রযুক্তিকে বৈদিক ভারত আর বর্তমান ভারতের কাঠামোয় বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করবেন সেটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু ভুললে চলবে না আমাদের (ভারতীয়) দেশীয় প্রযুক্তির উত্তরাধিকার কিন্তু সিন্ধু সভ্যতা থেকে শুরু, যা পৃথিবীর প্রাচীনতম নাগরিক সভ্যতাগুলোর একটি হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং পোড়ামাটি, মুদ্রা ও বাসনের জন্য আলাদা আলাদা ধাতুশঙ্কর থেকে শুরু করে কামারের হাপর, ধানের গোলা, সেচের জন্য সুপারি গাছের বাকল (দোনা), বাউলের একতারা, মাছ ধরার বঁড়শি, কাপড় রাঙানোর প্রাকৃতিক রং, চুনহলুদ, কম্পোস্ট সার, আমাদের জীবনের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা এইরকম অজস্র মণিমুক্তো, সবই হল আসলে দেশীয় প্রযুক্তি, যাদের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারও বলা যায়। দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ, আদিবাসী ও অরণ্যবাসী মানুষের জীবনচর্যা থেকে এদের সংগ্রহ করা যায়। কেউ এদের পেটেন্ট নেয় নি, বরং এদের পেছনে রয়েছে যে বিজ্ঞান, দেশি-বিদেশি ভাগাভাগির ঊর্ধে উঠে তা এক-একটি সূত্রের মতো বিভিন্ন সংস্কৃতিকে যোগ করে। একে প্রতিদিন চিনে নেওয়া অবশ্যই বিজ্ঞান সচেতনতার দিকে এগিয়ে যাওয়া।

উদাহরণ আরো দেওয়া যায়। মেঘালয়ের বাসিন্দারা কয়েকশো বছর ধরে এক বিশেষ ব্যবস্থার সাহায্যে জমিতে বিন্দুসেচ (drip irrigation) পদ্ধতি ব্যবহার করেন। বাঁশের পাইপের মধ্যে দিয়ে ১৮-২০ লিটার জল নানা বাঁক ঘুরে তার উৎস থেকে কয়েকশো মিটার দূরে গাছের গোড়ায় যখন পৌঁছায় তখন তা মিনিটের ২০-৮০ ফোঁটায় পরিণত হয়েছে। কোহিমার লোকজন এক বিশেষ পদ্ধতিতে খাড়াই পাথুরে জমিতে ধাপে ধাপে চাষ করেন যাতে জমির ভাঙন একটুও হয় না বরং ৫-৭ সেন্টিমিটার গভীর মাটিতেই ফসল ফলে। এক ধাপে সেচের উদ্বৃত্ত জল আরেক ধাপে গড়িয়ে গিয়ে সেচ সম্পন্ন করে এবং জলের অপচয় রোধ করে। অস্ট্রেলিয়ার গুণ্ডিতমারা উপজাতির লোকজন এক বিশেষ পদ্ধতিতে পুকুর-জলা-খাল-বাঁধ জুড়ে জুড়ে মাছ (মূলত ইল মাছ) চাষের এক আশ্চর্য ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছেন, যা এখনো কাজে লাগানো হয়।

প্রাচীন যন্ত্রনির্ভর আধুনিক সভ্যতায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পরও এই ঘরোয়া প্রয়োগ-কৌশলগুলোর গুরুত্ব কমে না বরং এদের নিয়ে নতুন করে ভাবতে হয়। তার কারণ এই প্রযুক্তিগুলি বেশিরভাগই প্রকৃতিনির্ভর কিছু পদ্ধতির সন্ধান দেয়, যারা দূষণমুক্ত, সাশ্রয়ী এবং যতটুকু দরকার ততটুকুই হাতে তুলে দেয়। ফলে বাজার সংস্কৃতির 'মেক ইট লার্জ' নীতির বিপরীতে গিয়ে ঘরোয়া প্রযুক্তি স্বভাবতই পরিবেশ বান্ধব (সংরক্ষক) হয়ে ওঠে। পরিবেশবিজ্ঞানে যেমন তিনটি আর (3R: Reduce, Reuse, Recycle) একটি বিশেষ দর্শনের দিকে নির্দেশ করে, তেমনি দেশীয় বা ঘরোয়া প্রযুক্তিও তিনটি আর (Relation, Reciprocation, Reflexion)-এর ওপর নির্ভর করে থাকে। এই প্রযুক্তির অন্তরালে রয়েছে এই ধারণা যে, বিশ্বে সমস্ত বিষয়ই পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত; সবকিছুর আড়ালে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক কাজ করে যায়। ঘরোয়া প্রযুক্তিতে কোনো কিছুর মূল্যে (অর্থাৎ কোনো কিছুর ক্ষতি করে) কিছু অর্জন করা হয় না। এই ধরনের প্রযুক্তির অন্তর্নিহিত জ্ঞানধারা দেশীয় (স্থানীয়) মানুষের মধ্যে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বয়ে যায় এবং উন্নততর হয়ে ওঠে। তাই এই ধরনের প্রযুক্তির চর্চা আসলে এক ধরনের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারও বটে!

এই প্রসঙ্গে দুটি কথা উল্লেখ করা দরকার। প্রথমত ভারতবর্ষে ইদানীং প্রয়োগকৌশল (ইনোভেশন) মুখী কাজকর্মের গুরুত্ব অনেকটা বেড়েছে। দেশীয় প্রযুক্তির উদাহরণগুলো অনেকটাই ইনোভেশনের সঙ্গে সমার্থক বলে মনে হলেও এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে; সব ইনোভেশনই প্রযুক্তি নয়। দ্বিতীয়ত, দেশীয় প্রযুক্তির এই চর্চা পুরনো প্রযুক্তির কাছে ফিরে যাবার জন্য নয়; বরং এই প্রতিটি প্রযুক্তির পেছনে যে জ্ঞান তাকে আবিষ্কার করা এবং তাকে উন্নততর কাজে লাগাবার (upscaling) উদ্যোগ নেওয়াই আসল কথা। এই বিষয়ে একটি চমৎকার উদাহরণ হল ঢেঁকি। ধানের খোসা

ছাড়াবার এই একান্ত দেশীয় প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্বয়ংক্রিয় ঢেঁকিতে ধান ছাঁটার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এতে প্রায় বিনা পরিশ্রমে অনেক তাড়াতাড়ি কাজ সারা হয়। প্রায় ১৫০০ বছর আগেকার চোল সাম্রাজ্যের সমকালীন স্বস্থায়ী সেচ ব্যবস্থার ধারণাকে কাজে লাগিয়ে ইতিমধ্যেই শুকিয়ে যাওয়া ৩৫টি ঝিলকে জলে ভরিয়ে তুলেছেন 'ঝিল-মানব' আনন্দ মাল্লিগাওয়াড।

তাহলে আধুনিক গবেষণানির্ভর যে সব প্রযুক্তি (কৃষি, ধাতুবিদ্যা, মহাকাশবিজ্ঞান) মূলত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কৃতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের কি দেশীয় প্রযুক্তি বলব না? অবশ্যই বলব। সেই বিজ্ঞানীদের কাজের কথা বিস্তারিত জেনে নিয়ে তাঁদের কৃতিত্বে গর্ব বোধ করব। কিন্তু উচ্চপর্যায়ের গবেষণাকেন্দ্রিক কোনো বিষয়ের গবেষণা দেশে হলেই সেটা আর 'দেশীয় প্রযুক্তি' হয়ে ওঠে না। গবেষণা এখন বিশ্বজুড়ে চলে; তার কতটুকু সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তির অবদান, সেটা সেই বিজ্ঞানীরা ছাড়া কেউ ঠিকমতো জানেন না। তাই সরকারি উৎসাহে আত্মনির্ভর (!) ভারতের জয়গানে গলা মেলানো ছাড়া এই বিষয়ে সাধারণ মানুষের চর্চার বিশেষ সুযোগ নেই। সরকারও শুধু হাততালিটুকুই চান। কিন্তু বুঝে বা না বুঝে চিন্তা-ভাবনা-সচেতনতা গড়ে তোলার যে হাতিয়ার আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, যা প্রযুক্তি থেকে শুরু হলেও আসলে অন্তর্নিহিত জ্ঞান ভাণ্ডারকেই নির্দেশ করে, তার সদ্ব্যবহার করাই আমাদের লক্ষ্য।

আত্মনির্ভরতা যদি ফলাফল হয়, তাহলে কারণ হওয়া উচিত সরকারী উদ্যোগ। তার নমুনা হিসেবে সম্প্রতি পাওয়া একটি তথ্য উল্লেখ করি। চন্দ্রযানের পরবর্তী মহাকাশযান নিয়ে গবেষণা চলছে কলকাতার একটি গবেষণাগারে; সেখানে কাজের জন্য দরকার ছিল একটি 'কন্ট্রোলড্ এনভায়রনমেন্ট চেম্বার' যার দাম ১৮-২০ লক্ষ টাকা। গবেষণার ক্ষেত্রে এই টাকার অঙ্কটা খুব বেশি কিছু নয়। কিন্তু অনুদানের অভাবে দেশীয় প্রযুক্তিতে ৩ লক্ষ৬৫ হাজার টাকায় সেটা তৈরি করে কাজ চালানো হচ্ছে। এইরকম 'চাপে পড়া' (দেশীয়) প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের খবর সব গবেষণাগারে ছড়িয়ে আছে। সরকার কি এটাকেই 'আত্মনির্ভরতা' বলে দাবি করে অনুদানের অভাব হাততালি দিয়ে পূরণ করতে চান? সেইভাবে আর যাই হোক 'বিকশিত ভারতের' ছবি আঁকা যাবে না, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। ভ মা

প্রসঙ্গ জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়ন

অঞ্জনকুমার সেনশর্মা

যখন কোনো একটি দশক, এমনকি কোনো এক বছরের আবহাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞদেরও বলতে শুনি 'জলবায়ু বদলে যাচ্ছে', তখনই মনে হয় 'জলবায়ু' শব্দটার সম্যক ও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আলোচনার এটি পূর্ব শর্তও বটে। আজকের আলোচ্য অবশ্য 'পরিবর্তন' ধারণাটিও, কারণ জলবায়ু প্রসঙ্গে পরিবর্তন শব্দটিরও একটি বিশেষ দ্যোতনা রয়েছে।

জলবায়ু : আমাদের বায়বীয় পরিবেশের অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের যে সব পরিস্থিতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেগুলিকে বর্ণনা করতে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয় — একটি 'আবহাওয়া' অন্যটি 'জলবায়ু'।

'আবহাওয়া' বায়ুমণ্ডলের বাস্তব ঘটনা বা পরিস্থিতির বর্ণনা—কোনো এক নির্দিষ্ট সময়সীমায়—মিনিট, ঘণ্টা, দিন থেকে শুরু করে বছর বা দশক এবং কোনো এক নির্দিষ্ট জায়গায়—তা যে গ্রাম, জেলা, প্রদেশ বা দেশ, সত্যিই যা ঘটেছে বা ঘটে চলেছে তার বর্ণনা। মূলত ঝড়, বৃষ্টি, তাপমান, আর্দ্রতা, মেঘ ইত্যাদি।

এই 'আবহাওয়া' সর্বদাই বদলাচ্ছে। এক জায়গাতেই মিনিটে মিনিটে, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, একদিন থেকে পরের দিন, এক সপ্তাহ থেকে পরের সপ্তাহে, এক মাস থেকে পরের মাসে এমনকি এক বছর থেকে পরের বছর।

কিন্তু এই সদাচঞ্চল আবহাওয়ার একটা দীর্ঘকালীন, অচঞ্চল প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক বনসম্পদের বিভিন্নতায়। মনে হয় যেন স্থানীয় আবহাওয়ার দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা কিছু অবিচল ধারা রয়েছে, যার ভিত্তিতে সেখানকার বৃক্ষরাজির বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়েছে। আবহাওয়ার এই অবিচল বৈশিষ্ট্যটুকুই 'জলবায়ু'; কোনো এক স্থানের বা অঞ্চলের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার নির্যাস।

সংজ্ঞা— বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের জন্য এর একটি সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। 'জলবায়ু' হচ্ছে তিরিশ বছর ধরে সংগৃহীত আবহাওয়া তথ্যের গড় ও তাদের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মাত্রা।

পরিবর্তন— জলবায়ু শব্দটার মধ্যেই অপরিবর্তনীয়তার প্রত্যাশা লুকিয়ে থাকে। বিশেষ করে যখন দেখতে পাই যে

পৃথিবীর, এমনকি আমাদের এই দেশেও বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু শুধু যে সেই অঞ্চলের প্রকৃতির দান, যেমন জল, শস্য, ফল, বনানী ইত্যাদি বিভিন্ন করে দিয়েছে তাই নয়, মানুষের শারীরিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও বিভিন্ন করে দিয়েছে।

তবে 'জলবায়ু' যে বদলায় সে তো আমরা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝতে পারি। একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড থেকে জন্মে পৃথিবীর জলবায়ু যদি একই থাকত তাহলে আপনাদের এই জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধটি পড়তে হত না। এমনকি মানুষের আবির্ভাবের পরও পৃথিবীর জলবায়ু যে বহুবার বদলেছে প্রত্ন নিদর্শনে তার প্রমাণ রয়েছে। 'জলবায়ু'র সংজ্ঞায় কালসীমা তিরিশ বছর নির্দিষ্ট করে দেওয়ায় পরিবর্তনের সেই অপরিবর্তনীয় ধারারই স্বীকৃতি। তবে এখন পরিবর্তন নিয়ে এত শোরগোল কেন? কারণ একটাই---অতীত পরিবর্তনগুলো এত ধীরে, এত দীর্ঘ সময় ধরে হয়েছে যে তার সঙ্গে মানিয়ে নেবার সময় মানুষ পেয়েছে। বর্তমান দুশ্চিন্তার কারণ কল্পিত পরিবর্তনের দ্রুততা। মানিয়ে নেবার সময় পাওয়া যাবে না, মনুষ্যজাতি বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটবে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয়। কোথাও সমুদ্রের গ্রাস, কোথাও অনাবৃষ্টি, কোথাও বন্যা বা বিধ্বংসী ঝড় ইত্যাদি। দুশ্চিন্তায় আরেকটি মাত্রা যোগ হয়েছে এ ধারণা থেকে যে এ পরিবর্তন আসছে মানুষেরই ক্রিয়াকলাপে।

আজকের আলোচ্য বিষয়ের শিরোনাম সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ শব্দটি হচ্ছে 'বিশ্বব্যাপী'। কারণ স্থানীয় বা আঞ্চলিকভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন তো অহরহ ঘটছে। 'শীতাতপ নিয়ন্ত্রক' যন্ত্রের কথা ছেড়েই দিলাম (যাকে বিক্রেতারা 'জলবায়ু নিয়ন্ত্রক' আখ্যা দিয়ে বিক্রি করেন)। আমাদের বেশভূষা, আমাদের ঘরবাড়ি এ সবই উন্মুক্ত প্রাকৃতিক জলবায়ুকে আমাদের পছন্দমতো পরিবর্তন করে নেবার জন্য। বন কেটে গ্রাম হয়, গ্রাম ক্রমে হয়ে ওঠে নগর—প্রতিটি ধাপে স্থানীয় জলবায়ু বদলে যায়। বিপরীতে ঊষর ভূমি সবুজায়ন করে বা জলধারা নিয়ে এসে সেখানকার জলবায়ু বদলে দেওয়া হয়।

'বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনে'র অধিকাংশ আলোচনা থেকে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে ওই ছোট্ট 'বিশ্বব্যাপী জলবায়ু' কথাটার মধ্যে কি বিশাল পরিমাণ তথ্য পুঞ্জিত হয়ে আছে, সে ধারণাটা অনুপস্থিত। কেবলমাত্র কোনো একটি স্থানের, শহর হোক বা গ্রাম, জলবায়ুর কথা ভাবলেও দেখা যাবে সেই কথাটি মধ্যে সেই সব অস্থির উপাদান। যেগুলিকে সমষ্টিগতভাবে আবহাওয়া বলা হয় তাদের বিভিন্ন ছন্দের ওঠা-পড়া, বাড়া-কমা অর্থাৎ দোলন বিভিন্ন কালসীমা ও বিস্তার নিয়ে উপস্থিত। এই দোলনের মধ্যে আছে অর্ধ-আহ্নিক থেকে শুরু করে আহ্নিক, ঋতুভিত্তিক, বাৎসরিক হয়ে দ্বি-বাৎসরিক পর্যন্ত। যখন আমরা একটি বিস্তৃত অঞ্চলের, যেমন ভারতবর্ষের জলবায়ুর কথা বিবেচনা করি তখন তার মধ্যে এসে পড়ে দ্রাঘিমা, উচ্চতা, সমুদ্র থেকে দূরত্বজনিত ভিন্নতাও। তাই আমরা যখন 'বিশ্ব জলবায়ু' প্রসঙ্গে আসি তখন মনে রাখতে হবে যে এই শব্দ দু'টি এইসব কালসীমাগত ও অবস্থানগত বিভিন্নতার সমষ্টি আবৃত করে আছে।

প্রশ্ন ওঠে, তাহলে 'বিশ্ব জলবায়ু' নামের এই জটিল ধারণার 'পরিবর্তন' বলতে কি বুঝি?

বিশদ করতে আসুন আমরা 'জলবায়ু'র একটি উপাদানকে উদাহরণ হিসেবে বেছে নিই। সেটি হচ্ছে 'তাপমান'। যেটিকে 'জলবায়ু পরিবর্তনে'র সূচক হিসেবে নেওয়া হয়েছে এবং যার ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তনের বিভিন্ন দৃশ্যকল্প রচনা করা হয়েছে।

তাপমান সর্বক্ষণ বদলে যাচ্ছে। তার একটি চক্র পূর্ণ হচ্ছে দিনান্তে অন্যটি বৎসরান্তে। আবার আবহাওয়াজনিত ক্ষণস্থায়ী অনেক বাড়া-কমা, ওঠা-পড়া এই বদলের ওপর যোগ হচ্ছে। জলবায়ুর এই উপাদানটিকে সংখ্যায় ব্যক্ত করার জন্য এর এই সদাচঞ্চল অস্থিরতার চারটি মাপ ব্যবহার করা হয়। দিনের বা সর্বোচ্চ তাপমান, রাতের বা সর্বনিম্ন তাপমান, এ দু'টির মধ্যেকার তাপমানের বিস্তার ও গড় তাপমান। ধরে নেওয়া হচ্ছে এই শেষেরটির পরিবর্তনই জলবায়ু পরিবর্তনের ঘটক।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে 'গড় বিশ্ব তাপমান' ধারণায় ভৌগোলিক অঞ্চলগত বৈষম্য ছাড়াও আরও কয়েকটি গুরুতর সমস্যা রয়েছে---দু' গোলার্ধের বাৎসরিক তাপমানের বিপরীতমুখিতা, পৃথিবীর প্রায় ৮০ শতাংশ অঞ্চল থেকে আবহাওয়া তথ্যের অনুপস্থিতি, ইত্যাদি।

এই সব সমস্যার পর রয়েছে পরিবর্তন সনাক্ত করার সমস্যা। একটি তিরিশ বছরের গড় তাপমান অন্য তিরিশ বছরের গড় থেকে ভিন্ন হলেই সেটাকে পরিবর্তন বলে চিহ্নিত করা অবৈজ্ঞানিক। প্রমাণ করতে হবে এ ভিন্নতার কারণ ওই কালসীমায় তাপমানের কোনো স্বাভাবিক দোলন নয়। অথচ এ প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় দূর অতীত পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য তাপমান তথ্য নেই।

পরিবর্তন পূর্বাভাস

'জলবায়ু পরিবর্তন'-এর পূর্বাভাস রচনার প্রক্রিয়ায় যে

নিয়ে বলেছেন যে আমাদের ভবিষ্যৎ অধিকারী নির্ভর করছে
(২০১৩) এই ছবিটির কথা আবার বলা হয়েছে। তাঁরা জোর
দিয়েছে কথা সবাই জানেন। তাঁদের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত
থাকে। তারপর ৫ বছর পরে, তাদের প্রত্যেক বিদ্যালয় চিকিৎসা
ট্রি ট্রি), । তাঁদের প্রথম প্রকাশিত প্রচারণা হয় চার বছর
পরিবর্তন বিষয়ে আন্তঃসংযোগ আলোচনা যোগ্য (আই টি
সাপ্তা পাওয়া যায় টি। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়, অলবার্ট
এই প্রচেষ্টাকে নিয়ে গিয়ে যেতে চেষ্টা করেছে। যেমনভাবে
কয়েক বছর পরপরই নানান সংস্থা প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন
আগে যাচ্ছিলেন প্রথম সম্প্রদায় প্রচার করে। তারপর থেকে
পরিবেশের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বাইরে অংশগ্রহণ
নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করতে থাকে হয়েছেন। পরিবার
অধিকার সংগঠন হয়েছে বিদেশের সব দেশের যাচ্ছিলেন পরিবেশ,
বিশ্বব্যাপী অলবার্ট পরিবর্তন, নিয়ে এই চাপের একটা আমাও
তবে স্বীকার করতেই হবে এ সব সংগঠন সচেতন
হোক।
সংগঠন দেশেই গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় উদ্দেশ্যে নানা হবার
টিকানার বছরগুলো কম হবার কথা। বিশ্ব অলবার্ট পরিবর্তনের
নির্ভরযোগ্যতা আবহাওয়া সংগঠনের নির্ভরযোগ্যতার
তাই আন্তিক বিচারে এই প্রতিবাদের ভবিষ্যতের
নি।
শেষে বাস্তব হয়ে যায় দেশগুলো এখনও সাধারণভাবে অনেক যায়
সম্পর্কে আমার, যেমন বাস্তবতা, সরল, প্রবণতা উদ্যোগের
বিভাবে এই সব নদীর বাস্তব নিঃসরণ বিশ্বের অঙ্গুর
নিয়ে যায় তার অর্থনীতির জোর কথা আমাও কারণ। এখানেও
ক্ষুদ্রের নদীর যে যে দ্বি-রাসায়ন এবং জৈব প্রতিকার শক্ত
করতে পারে। উপকার হবার পর কারণ ভাই অজানা অজানার
শিল্প সীম বিজ্ঞান, এখন ওই বিষয় জৈবিক প্রতিকার অর্থনীতির
প্রসারের কথা হয়। উপরন্তু এইসব অর্থনীতিগুলো, প্রাথমিক
সংগঠনের ক্ষেত্রে এদের কারণ বছরও সীম ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি
আবহাওয়া যাচাই সময় পরিস্থিতি অনুকরণযোগ্য, অলবার্ট
সমাধান করার অসাধারণ। তবে এইসুবিধা যে, তাৎক্ষণিকভাবে
করার এবং এ সংস্থাও সম্প্রদায়গুলোর বিশেষজ্ঞদের
দেশগুলোকে প্রাথমিক অর্থনীতিতে যথাযথ প্রতিরোধের
প্রাথমিক সংগঠনও এক— বাস্তবতাদের আদর্শের বিশ্বাস
অর্থনীতিগুলোর শিক্ষাতেই কোনো প্রভাব দেয়। এ সূত্রের
এর সঙ্গে বিভিন্ন আবহাওয়া সংগঠনের কাছে দিতে বাধ্যতা
প্রাথমিক অর্থনীতি ব্যবহার হয় তা অবশ্যই আমাও জানুন।

শিক্ষা গ্রহণ করেন তবে আমরা সবাই উপকৃত হব। শেষ

তাই শেষে হয় প্রজন্মের সংগঠকেরা যাতে এই প্রতিবাদের
করবেন না।

তাঁদের ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ীর আত্মরক্ষার কথার আগেই অর্থের
বলে অর্থায়ন করতে পারবেন তাহলে তাঁরা কর্মসূচিগুলো
তাঁরা আমাদের এই সমাজসেবা, যেমন তাঁদের সাহায্য, যেমন
তাদের সাহায্য সহযোগিতা। শেষে থাকতে হবে যাতে না
এখনো অবশ্যই আমাদের অংশগ্রহণকে সঙ্গে নিয়ে, নিয়ে
সচেতনতার এক প্রশিক্ষণের এগিয়ে যায়।
করতে হবে। তাই আমাদের উদ্যোগ হতে হবে, কারণ সমাজ
বিভিন্ন ধারায় উন্নয়ন হচ্ছে। এসবের বিরোধিতায় আমাদেরও জোর
অবহেলার অনেক অসহায় করে যাচ্ছে, যাতে শান্তি বাধা হচ্ছে,
শিক্ষার অনেক বঞ্চিত আমরা যথেষ্ট হচ্ছে, আমরাও
কাজে না পেয়েও আমাদের স্বপ্নের শিক্ষা করছে। পরিবেশের
শিক্ষার ধারাও হচ্ছে। তারা বাস্তবতাকে উপেক্ষা করার
বা জেনে সচেতন আমরা ওই, উন্নয়নের ধারায় নয় আরও অনেক
মানুষের জন্যই আমাদেরও সচেতন হবার সময় এসেছে। কারণ
এই সব প্রতিকারের মাধ্যমে সুশিক্ষিত বলতে হয় নিজেদের
বিবেক বাচনা উদ্ভাবন করেছেন।
বিকল্প উদ্যোগে তাঁরা, আশার আলো, (কারণ জোগান) নামে এক
তাঁরা তাদের প্রকাশ ভাষা বলাতে পারবেন না। বিভিন্ন এর
কোনো বলনস্থ যাচ্ছিলাম সমস্ত জোরদার করবেন না বলে যে
দেশগুলোর সাফল্যের প্রচারের মাধ্যমে সুশিক্ষিত এখন আর
এই চিত্রায়ণের দৃষ্টিতে এখনও সচেতন। উন্নয়নমূলক
সংরক্ষণ-সংস্থা অসবাই, রাখনা।
কথাগুলোর অনেক বিশেষায়িত উপদেশ। তাদের অনেক জ্ঞান না কোনো
জ্ঞান উন্নত দেশগুলোর উদ্ভাবন অসহায় ও নাগালহারা জোয়
আর কোনো চাপ না পড়ে। আন্তর্জাতিকভাবে অর্থসাহায্য
ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রচেষ্টায় সম্ভব হবে যাতে পরিবেশের ওপর
প্রভাব জ্ঞান এই নিয়ম, যে উন্নয়নকামী দেশগুলো তাদের
কোনো এক পর্যায়ে অসম্পূর্ণ অবস্থায় থামতে দিতে না হয়।
বিচার হবে প্রকৃতির ওপর তার আশ্রয়, যাতে সে প্রচেষ্টা
উন্নয়ন, রাখনার প্রতি। অন্যথায় প্রাকৃত উন্নয়ন প্রচেষ্টার আগে
বিভিন্ন প্রথম থেকেই এ সবের জোরক জ্ঞান, সংরক্ষণ-সংস্থা
তার ওপরে।
আমাদের চিন্তাভাবনা এবং আমরা বিভাবে ব্যবসায়ীদের কাছে

১৮৩০-৪০ দশকের কলকাতা ঃ বরফের বাণিজ্য, মেডিসিনে বরফের ব্যবহার

জয়ন্ত ভট্টাচার্য

আজ এ কথা ভাবতে বেশ চিত্তাকর্ষক লাগে যে, গ্ল্যাডউইন নামে এক সাহেব ১৭৮৮ সালে এক মুসলিম লেখকের লেখা থেকে অনুবাদ করেছিলেন। সে লেখার দু-একটি জায়গা নজর কাড়ে—(১) নবাব মুর্শিদকুলি খান সমস্ত রকমের বিলাসিতা, সে পোশাক-আশাকেই হোক বা খাবার ব্যাপারে—পরিহার করে চলতেন, (২) কিন্তু তাঁর খাবারের টেবিলে ক্রিম বা জমানো শরবত পছন্দের না হলেও বরফ ছিল খাদ্যতালিকার একেবারে প্রথমে, (৩) আরও মজার — 'During the winter Khyzir Khan, his house steward, used to collect, in tne mountains of Rajmehal, *a sufficient stock of ice for the rest of the year* and the whole was done at the expense of the zemindars of that district.' (Kathleen Blenchynden, *Calcutta Past and Present*, London, W.Thacker, 1905, পৃ.৩৪-৩৫)

অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজপুরুষ এবং ডাক্তারদের হাত ধরে কলকাতায় বরফের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে ওঠার আগেই, অন্তত ৫০ বছর আগে, মুর্শিদকুলি খানের মতো মুসলিম শাসকদের দরবারেও বরফের জনপ্রিয়তা ছিল। এবং এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে সে সময়ে রাজমহল পাহাড়ে সারা বছরের জন্য সংগ্রহ করে রাখার মতো যথেষ্ট পরিমাণ বরফ জমতো। মানুষের আক্রমণে প্রকৃতি তখনও এরকম ধ্বস্ত হয়ে যায় নি, ইতিহাস সে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কলকাতার সংবাদ

ঊনিশ শতকের বিখ্যাত *সমাচার দর্পণ* পত্রিকায় ১৮ মাঘ, ১২৪২ তথা ৩০ জানুয়ারি, ১৮৩৬-এ একটি ছোট্ট সংবাদ প্রকাশিত হয় 'চুঁচুড়ায় বরফ' শিরোনামে। সে সংবাদে বলা হয়—'স্কট সাহেবের গেজেটে প্রকাশিত এক পত্রে দৃষ্ট হইতেছে যে জানুআরি মাসের প্রথম ২০ দিবস পর্যন্ত চুঁচুড়ায় বরফকুণ্ডে ২১৮৬ মোন বরফ উৎপন্ন হইয়াছে এবং ঐ বরফ মোন করা ১০ টাকা অবধি ১৩ টাকা পর্যন্ত বিক্রয় হইয়াছে।'[১]

স্থানীয় পদ্ধতিতে কিভাবে তৈরি হত বরফ? প্রায় ১২০ ফিট লম্বা, ২০ ফিট চওড়া এবং গভীরতায় ২ ফিট একটি গর্ত খোঁড়া হত। গর্তটির ভেতরে এবং চারপাশ যতদূর সম্ভব মসৃণ করা হত। সূর্যের তাপে যখন মাটি শুকিয়ে যেত তখন খড় দিয়ে ঠেসে ১ ফুট ভরে দেওয়া হত। এর উপরে আরও ৬ ইঞ্চি আলগা খড় দিয়ে তার ওপরে ছোট কড়াইয়ের মতো যে পাত্রগুলিতে বরফ তৈরি করা হবে সেগুলো পরপর বসানো হত। এর ওপরে আবার খড় দেওয়া হত। এভাবে কয়েকদিন রেখে দিলে বরফ তৈরি হত।[২]

কৌতূহলী পাঠকরা জানতে চাইবেন— হঠাৎ ১৮৩৬ সালে চুঁচুড়ায় বরফ তৈরি এবং বিক্রির খবর সমাচার দর্পণ-এ প্রকাশিত হচ্ছে কেন? ১৮৩৬-এ খবর হিসেবে প্রকাশিত হবার অর্থ হল আরও কিছুদিন আগে থেকে এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কেন? এজন্য ১৮৩০-এর দশকের কলকাতার এক ইতিহাস আমাদের জেনে নিতে হবে। কৌতূহলোদ্দীপক সে ইতিহাস।

প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার, ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত কলকাতায় বরফের সরবরাহ নির্ভর করত 'হুগলির কিছু ফাটকাবাজ বরফ সরবরাহকারীর খেয়ালখুশির ওপরে, যারা যতটুকু তাদের জন্য লাভজনক ততটুকুই উৎপাদন করত এবং আবহাওয়া যতটুকু সাহায্য করত সেটাও একটা ব্যাপার ছিল।'[৩] (আমি এই তথ্যসূত্রের জন্য আমার বন্ধু ঐতিহাসিক ইন্দিরা চৌধুরীর কাছে ঋণী।)

আমেরিকান ব্যবসায়ী তথা উদ্যোগপতি ফ্রেডেরিক টিউডরের (Cotton-এর তথ্য অনুযায়ী, টিউডর একজন apothecary-ও ছিলেন) রপ্তানি করা বরফ কলকাতায় আসার আগে অব্দি চুঁচুড়ায় তৈরি বরফই কলকাতার বরফের একমাত্র সরবরাহ ছিল। প্রথমদিকে এই বরফের প্রধান ব্যবহার ছিল ব্রিটিশ রাজপুরুষ এবং বাঙালি বাবুদের ''claret wine'' ঠাণ্ডা রাখার কাজে। ফ্রেডেরিক টিউডর দুটি নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তু যেমন বস্টনের পুকুরে জমা বরফ এবং মাইন (Maine) অঞ্চলের কাঠের মিহি গুঁড়োকে জুড়ে 'নিউ ইংল্যান্ডে একটি বড়োসড়ো ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়েছিল যা বহুল পরিমাণে রপ্তানি করা হত।'[৪]

ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল পত্রিকায় (No. XXVII, 1st May, 1837) প্রকাশিত হল একটি বিশেষ সংবাদ 'আমেরিকান

আইন' শিরোনামে। এ সংবাদে বলা হল, আমেরিকার বস্টন শহরের ব্যবসায়ী ফ্রেডেরিক টিউডর (Frederick Tudor) কলকাতা শহরে বরফ রপ্তানি করতে চান। এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন কলকাতার তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের নামী ব্যরিস্টার Lonouville Clarke। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার, ১৭৭৪ সালে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। ১৮৬২ পর্যন্ত এর কাজ চলে। ১৮৬২ সালে হাইকোর্ট তৈরি হলে সুপ্রিম কোর্টের অবলুপ্তি ঘটে। ১৭৭৪-এ সুপ্রিম কোর্টের প্রথম বিচারপতি ছিলেন ইলাইজা ইম্পে (Elijah Impey) এবং শেষ বিচারপতি বার্নেস পীকক (Barnes Peacock), যিনি ১৮৬২ সালে কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি হন। মধ্যবর্তী সময়ে উইলিয়াম জোনস থেকে এডওয়ার্ড রায়ানের মতো ব্যক্তিত্বরা প্রধান বিচারপরিত দায়িত্ব সামলেছেন। এখানে একথাও জানানো প্রয়োজন, আলোচিত মিটিংয়ে হাভানাতে যে দীর্ঘদিন ধরে নিরুপদ্রবে বরফের সরবরাহ চলছে এ নিয়ে মত বিনিময় হয়।

আমরা আগের সংবাদে ফিরি। Lonouville Clarke-এর উদ্যোগে ১৮৩৬ সালে 'আমেরিকান আইস কমিটি' তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা থেকে (বস্টন শহর) নিয়ে আসা বিপুল পরিমাণ বরফ রাখার স্থানের সংকুলান ছিল না কলকাতায়। একটি ছোট আইস হাউস ছিল বটে, সম্ভবত ১৮৩২ সালে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এর আয়তন বৃদ্ধি না করলে কলকাতা শহরে বরফের চাহিদা এবং রপ্তানি করা বরফকে ঠিকমতো সংরক্ষণ করা যাবে না, এই ছিল ক্লার্কের মূল প্রতিপাদ্য— 'যদি আইস হাউসের আয়তন বাড়ানো না হলে সারা বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত সরবরাহের নিশ্চয়তা থাকবে না।'[৫]

এ সংবাদটি ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৭-এর। এর আগে টিউডরের একটি চিঠি ক্লার্ককে লেখা হয়। সে চিঠিতে টিউডর লেখেন— 'বরফের নিয়মিত সরবরাহ প্রতিষ্ঠিত হবে এমনটা আশা করা যায় না, যদি না বরফের ব্যবহার বাড়ে এবং আইস হাউসকে অনেক বড়ো আকৃতির বানানো না হয়।[৬] এরপরে 'Ice Meeting'-এ সর্বসম্মতিক্রমে বরফ ঘরের আয়তন বাড়ানো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

টাউন হলের মিটিংয়ে (১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৭) সর্বসম্মতিক্রমে আইস হাউসের আয়তন বৃদ্ধির প্রস্তাব পাস হবার পরে সরকারের তরফে গঙ্গার ধারে জমি দেওয়া হয়, এবং কলকাতাবাসীরা ২৫,০০০ টাকা চাঁদা তোলে। একটি

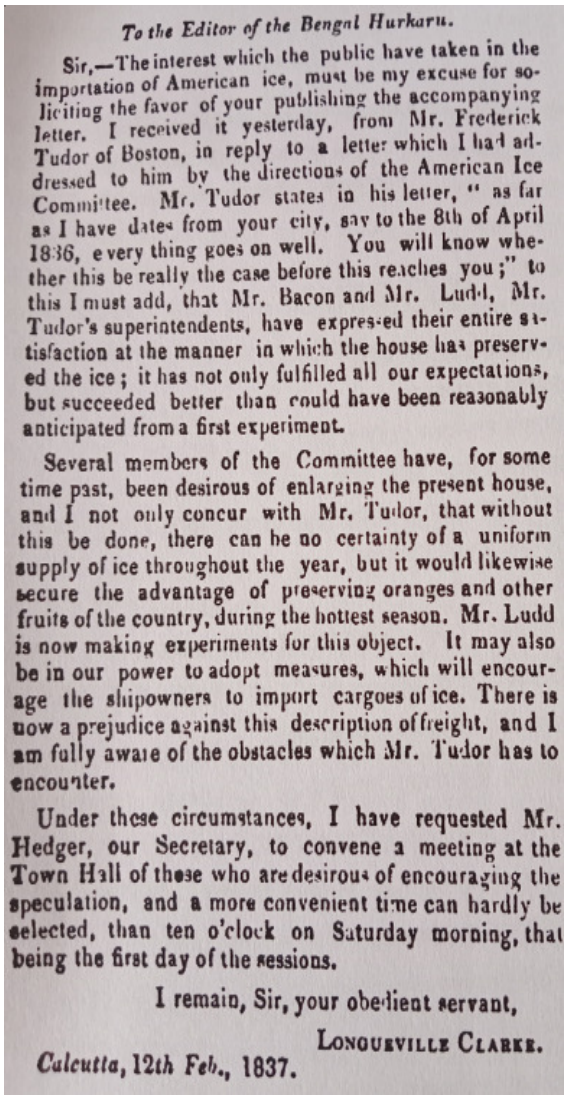

To the Editor of the Bengal Hurkaru.

Sir,—The interest which the public have taken in the importation of American ice, must be my excuse for soliciting the favor of your publishing the accompanying letter. I received it yesterday, from Mr. Frederick Tudor of Boston, in reply to a letter which I had addressed to him by the directions of the American Ice Committee. Mr. Tudor states in his letter, " as far as I have dates from your city, say to the 8th of April 1836, every thing goes on well. You will know whether this be really the case before this reaches you;" to this I must add, that Mr. Bacon and Mr. Ludd, Mr. Tudor's superintendents, have expressed their entire satisfaction at the manner in which the house has preserved the ice; it has not only fulfilled all our expectations, but succeeded better than could have been reasonably anticipated from a first experiment.

Several members of the Committee have, for some time past, been desirous of enlarging the present house, and I not only concur with Mr. Tudor, that without this be done, there can be no certainty of a uniform supply of ice throughout the year, but it would likewise secure the advantage of preserving oranges and other fruits of the country, during the hottest season. Mr. Ludd is now making experiments for this object. It may also be in our power to adopt measures, which will encourage the shipowners to import cargoes of ice. There is now a prejudice against this description of freight, and I am fully aware of the obstacles which Mr. Tudor has to encounter.

Under these circumstances, I have requested Mr. Hedger, our Secretary, to convene a meeting at the Town Hall of those who are desirous of encouraging the speculation, and a more convenient time can hardly be selected, than ten o'clock on Saturday morning, that being the first day of the sessions.

I remain, Sir, your obedient servant,

LONOUVILLE CLARKE.

Calcutta, 12th Feb., 1837.

(লুইভিল ক্লার্ক-এর চিঠি)

কমিটিও গড়া হয়— আগেই উল্লেখিত 'আমেরিকান আইস কমিটি'। এতে পূর্বোল্লিখিত Lonouville Calrke ছাড়াও প্রেসিডেন্ট হিসেবে ১৮৩৩-১৮৪৩ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এডওয়ার্ড রায়ান, ইঞ্জিনিয়ার জেনারেল ফোর্বস, কলকাতার টাঁকশালের ডেপুটি অ্যাসে মাস্টার জেমস প্রিন্সেপ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে জেমস্ প্রিন্সেপ কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন এবং খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার করার মতো ঐতিহাসিক কাজ করেন।

বরফের বাণিজ্য

Kathleen Blechynden-এর পুস্তক প্রকাশের ২ বছর পরে প্রকাশিত হয় পূর্বোল্লিখিত Cotton-এর *Calcutta Old and New* (Calcutta:W. Newman & Co., 1907)। এ বইয়ে তিনি জানিয়েছেন, কলকাতায় যে প্রথম 'আইস হাউস' তৈরি হয় তার ওপরে বড়ো বড়ো করে লেখা ছিল— 'to cool'। তাঁর বর্ণনায় 'আইস হাউস'-এর অবস্থান ছিল — 'হেয়ার স্ট্রিটের বিপরীতে, ছোট Small Cause Court বিল্ডিং-এর পশ্চিমে, চোখ গিয়ে পড়তে বাধ্য আইস হাউসের বিসদৃশ এবং হোঁতকা চেহারার ওপরে।'[৭]

এ প্রসঙ্গে তিনি কলকাতা এবং মাদ্রাজের মধ্যে তুলনা করেন। যেখানে ১৮৮২ সালে কলকাতার এই 'আইস হাউস' গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় সেখানে ১৯০৫ সালেও তিনি মাদ্রাজে সমসাময়িককালে তৈরি 'আইস হাউস' সুরক্ষিত অবস্থায় আছে দেখতে পেয়েছেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য— 'কলকাতা একটু বেশি *iconoclastic* পরিমাণে এবং পরিচিত কাঠামোটির একখানি টুকরোও অবশিষ্ট নেই, যেখানে প্রায় ৫০ বছর ধরে Wentham Lake থেকে আহরিত কলকাতার মূল্যবান বরফের চাঙ্গরকে রাখা হয়েছে।'[৮]

ইতিহাসকে ভালবাসতে না শেখা এবং প্রাচীন স্থাপত্যগুলোকে ভেঙ্গে ফেলার ও কুদৃশ নতুন কাঠামো তৈরি করার এ ঐতিহ্য কলকাতা এখনও বহন করে চলেছে—হয়ত আরও শক্তিশালীভাবে।

বরফ আনার এবং রাখার ঝক্কি নেহাত কম ছিল না। প্রায় ১৩০ দিন সময় লাগত সমগ্র পথ অতিক্রম করতে। প্রায় ২০,০০০ মাইল সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে বস্টন থেকে কলকাতায় আসার যাত্রায় জাহাজে ১৮০ টন বরফ ভরা হলে যাত্রাপথে ৬০ টনের বেশি নষ্ট হয়ে যেত, অর্থাৎ গলে যেত। এবং সাগর থেকে কলকাতা বন্দরে আসতে আরও ২০ টন নষ্ট হত।[৯] ভারতে যে বরফ তৈরি হত তার ১ পাউন্ডের দাম পড়ত ৬ পেনি। কিন্তু আমদানি করা বরফের দাম ছিল ৩ পেনিতে ১ পাউন্ড। (পৃ. ১৯৯)

Henry Spry তাঁর *Modern India* (Vol.1, 1837) গ্রন্থে জানাচ্ছেন যে, ১৮৩২-এর শরৎকালে হুগলি নদীতে প্রথম বরফবাহী জাহাজ এসে নোঙ্গর করে। (পৃ.১৯২) আইস হাউস প্রতিদিন ভোর ৩টের সময় খুলে যেত। যদি বস্টন থেকে ৩০০ টন বরফ পাঠানো হত তাহলে কলকাতায় এসে 'of good serviceable ice' পৌঁছত ২৩৬ টন।

এখানে টিউডরের বরফ-বাণিজ্যের কথা সংক্ষেপে বলে নেওয়া যায়। প্রেডেরিক টিউডর তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন যে তাঁর দীর্ঘদিনের ইচ্ছে ছিল ভারতে বরফ রপ্তানি করা। পরে তাঁর সাথে বাণিজ্যিক পার্টনার হিসেবে অস্টিন এবং উইলিয়াম রজার্সের সাথে বন্ধুত্ব হয়। সফল হয় ভারতে বরফ রপ্তানি করার স্বপ্ন। অবশেষে Tuscany জাহাজে ভারতের জন্য প্রথম বরফ ভর্তি জাহাজে পাঠানো হল। (Gavin Weightman, *The Frozen Water Trade: how the ice from New England lakes kept the world cool*, 2003, 'A Cool Cargo for Calcutta', Chapter 8)

নিউ ইয়র্ক টাইমস্ সংবাদপত্রে (১ জুলাই, ১৯২৮) J. Milo Curci একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'FIRST "ICE KINGS'S" ROUGH SLEDDING: Frederick Tudor, a century Ago, Worked Thirty Years Against Ridicule to introduce 'Yankee Coldness' A Surprise for Dickens. Start of Ice Business. Tropics Shrank From Ice. Cargoes Went to Far East' শিরোনামে। তিনি এ প্রবন্ধে বলেন— **'অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো বাণিজ্যেও জনতাকে নতুন পণ্যের ব্যবহারে শিক্ষিত করে তুলতে হয়। পৃথিবীকে চিউয়িং গাম চিবোতে কিংবা ধূমপান করতে শেখাতে হয়েছে ...** অন্তত তিন দশক পরিশ্রম করার পরে তাঁর খ্যাতি কলকাতায় পৌঁছেছিল।'[১০]

যদিও হেনরি স্প্রাই বলেছেন, ১৮৩২-এর শরৎকালে প্রথম বরফবাহী জাহাজ এসে পৌঁছয়। কিন্তু গেভিন ওয়েটম্যান জানাচ্ছেন— 'কলকাতার ব্রিটিশ সমাজে সমস্ত আগ্রহ এবং সমস্ত উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল যখন যে জাহাজে করে এই ঐতিহাসিক পণ্য গঙ্গার ব-দ্বীপে সেপ্টেম্বর ১৮৩৩-এ এসে পৌঁছয়।'[১১] ওয়েটম্যান আরও জানাচ্ছেন— 'The British in Calcutta were quite obsessed with keeping cool. Houses were sometimes built with underground sitting rooms, and with raised terraces where advantage could be taken of cool breezes. Wetted cloths were hung over windows to provide a crude form of air conditioning, and the air was stirred constantly by punkahs। (প্রাগুক্ত)

যেদিন বরফের জাহাজ হুগলি নদীর মুখে এসে পৌঁছয় তখন তাপমাত্রা ছিল ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের আশেপাশে। বরফ কি করে গলে যাবার হাত থেকে বাঁচানো হবে এটাই ছিল প্রধান দুশ্চিন্তার কারণ। ইন্ডিয়া গেজেট পত্রিকায় বরফের ব্যবহার সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—'যদি প্রয়োজনীয় কিংবা বিলাসিতার সামগ্রীও হয়, বরফের ব্যবহার কেবলমাত্র খাবার

টেবিলে সীমাবদ্ধ নয়। একে অতিক্রম করে এর প্রবেশ ঘটেছে মেডিক্যাল প্র্যাক্টিসে, চিকিৎসার সহায়ক হিসেবে, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বহু ধরনের জ্বরের চিকিৎসার ক্ষেত্রে মূল চিকিৎসা হিসেবে কার্যকরী হয়েছে। এমনকি গরমের দেশের অ্যাকিউট রোগের ক্ষেত্রেও এটা কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে।' (Weightman, *The Frozen Water Trade*, প্রাগুক্ত) উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ২২ নভেম্বর, ১৮৩৩-এ যারা জাহাজে করে বরফ নিয়ে এসেছিল তাদের নেতৃত্ব রজার্সকে রূপোর গিলটি করা কাপ দিয়েছিলেন।

টিউডর কলকাতায় প্রতি পাউন্ড বরফ ২.৫ সেন্ট মূল্যে বিক্রি করতেন। ১৮৩৪-এ বরফ বিক্রি থেকে মুনাফা হয় '$13,552 in 1834 (worth in 2010 US $353,000) from which freight charges needed to be subtracted' (Herold, 'Ice in the Tropics', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬) এমনকি ১৮৫৫ সালের আগস্ট মাসে টিউডর হাওড়ায় গঙ্গার ধারে ৫,৮০০ টাকা মূল্যে জমিও কিনেছিলেন ব্যবসার সুবিধের জন্য।[১২]

ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল-এর আরেকটি সংখ্যায় বরফের দাম কমানো এবং সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য সরকারের কাছে 'remission of port duties'-এর আবেদন করা হয়। ('American Ice', *Calcutta Monthly Journal*, Third Series, Vol. IV, 1838, পৃ. ১১৮)

মেডিসিনে বরফের ব্যবহার

কিন্তু শুধু স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিলাসিতা দ্রব্য হিসেবে বরফের ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকলে বাণিজ্যিক দিক থেকে সেটা নিতান্তই অলাভজনক হবে। ফলে বরফের ব্যবহারের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ল মেডিসিন, যাতে ব্যবহারের ব্যাপ্তি এবং উপযোগিতা দুটোই বৃদ্ধি পায়।

উল্লেখ করার মতো বিষয় হল, এস নিকলসন নামে এক ডাক্তারের চিঠি থেকে ভিন্নধর্মী একটি বিষয় জানা যায়—'আমি এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে জানি যে, বরফ নিয়ে যে বাণিজ্য জাহাজ কলকাতায় এসে পৌঁছয় তার বেশিরভাগ খদ্দের ছিল **dirges** (দর্জি, ভৃত্য বা নিম্ন শ্রেণীর মানুষ অর্থে ব্যবহৃত) **যারা বরফের সংগ্রহের জন্য প্রতিদিন বিকেলে আইস হাউসে এসে ভিড় করত যাতে এক খণ্ড বরফ সংগ্রহ করতে পারে ৭ মাইল হেঁটে ফিরে যাবার আগে।**'[১৩]

সহজ কথায় বললে, দর্জি, ভৃত্য বা নিম্ন শ্রেণীর মানুষ ৭ মাইল হেঁটে এসে প্রতিদিন বিকেলবেলায় আইস হাউসে বরফ কেনার জন্য লাইন দিত। এখানে সঙ্গত প্রশ্ন আসবে—কেন দিত? বরফ এদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল কেন—বিশেষত ১৮৩৬-৩৮-এর কলকাতা শহরে? এ উত্তর আমার কাছে অজানা। হয়ত পুরনো কলকাতার বিশেষজ্ঞরা এর সমাধান করতে পারবেন।

কটন-এর পূর্বোক্ত পুস্তক থেকে জানা যাচ্ছে—'কলকাতার ২২জন মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার সরকারকে (বরফের ব্যবহারের উপযোগিতার স্বপক্ষে জোরালো সওয়াল করে) ২২টি আলাদা আলাদা সার্টিফিকেট পাঠান।'' তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল—'হাসপাতালের প্রথম চিকিৎসাগুলোর মধ্যে ছিল বরফের ব্যবহার।'[১৪] 'ice was among the first of remedies in the hospitals' (পৃ. ১৮৯-১৯০)

'American Ice' শিরোনামে বেশ বড়ো একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল-এ (*Calcutta Monthly Journal*, Third Series: Vol. IV, 1838, পৃ. ২৭০-২৭৫)। এর আগেই বলেছি, কলকাতায় 'আমেরিকান আইস কমিটি' তৈরি হয়েছিল, যার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন Lonouville Clarke, পরবর্তীতে চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন। এই কমিটির ১৮৩৭-এর জুলাই মাসের সভায় ৩টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল— সরকার যদি 'remission of port duties' করে (যেমনটা হাভানায় হয়েছে) তাহলে বরফের চাহিদা আরও বাড়বে।

দ্বিতীয়টি হল— মেডিক্যাল পেশার যাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বরফের vast importance to the public health, especially in cases of fever so incidental to this climate'-এর কথা বলেছেন।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত—কলকাতা শহরের বেশ কিছু সংখ্যক প্রথম সারির চিকিৎসক পাবলিক হেল্‌থের ক্ষেত্রে বরফের বিপুল গুরুত্বের কথা লিখিতভাবে কমিটিকে জানিয়েছেন। এবং তাঁদের চিঠিগুলো কমিটির মিটিংয়ে পেশ করা হয়েছিল।

পূর্বোল্লিখিত মোট ২২জন খ্যাতনামা এবং উচ্চপদস্থ চিকিৎসকের চিঠি কমিটির মিটিংয়ে পেশ করা হয়। এঁরা হলেন—(১) **জন গ্র্যান্ট**, যিনি ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিক্যাল সায়েন্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন (D.G.Crawford, *Roll of the Indian Medical Service*:1615-1930, Vo.1, 1930, পৃ. ৭০)। ২) প্রেসিডেন্সি সার্জেন আলেক্সান্ডার হ্যালিডে। ৩) জেনারেল হাসপাতলের

সার্জেন এস নিকলসন। ৪) গ্যরিসন সার্জেন **ফ্রেডেরিক করবিন** (Frederick Corbyn), যিনি ভারতের প্রথম মেডিক্যাল এবং ফিজিকাল সায়েন্সের জার্নাল *The India Journal of Medical and Physical Science* (1836)-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ৫) আলেক্সান্ডার গার্ডেন। ৬) মেরিন সার্জেন H.S.Mercks। ৭) **জেমস রানাল্ড মার্টিন**, যাঁর দুটি বিখ্যাত পুস্তক (ক) *Notes on the medical topography of Calcutta* (১৮৩৭) এবং (খ) *The Influence of tropical climates on European constitutions* (১৮৫৬)। ৮) প্রেসিডেন্সি সার্জেন উইলিয়াম ক্যামেরন। ৯) Officiating Army Hospital Corps আলেক্সান্ডার রাসেল জ্যাকসন। ১০) চবিশ পরগনার সিভিল সার্জেন Francis Pemble Strong (Crawford প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮)। ১১) চার্লস্ সি এগার্টন, যিনি পরে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের সার্জারি এবং ক্লিনিকাল সার্জারির প্রফেসর হয়েছিলেন। ১২) সার্জেন জর্জ ক্রেইগ। ১৩) **ডানকান স্টুয়ার্ট**, পরে মেডিক্যাল কলেজের ধাত্রীবিদ্যা বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক হয়েছিলেন এবং মেডিক্যাল কলেজে প্রথম ক্লোরোফর্মের ব্যবহার শুরু করে প্রসবের ক্ষেত্রে। ১৪) ফ্রেডেরিক হ্যারিংটন ব্রেট, যাঁর সুবিদিত গ্রন্থ হচ্ছে *A practical essay on some of the principal surgical diseases of India* (১৮৪০)। ১৫) অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন জে টি প্যাটারসন। ১৬) জেনারেল হাসপাতালের ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন ওয়ালটার র‍্যালে। ১৭) মেডিক্যাল কলেজের প্রফেসর অফ অ্যানাটমি ও মেডিসিন হেনরি গুডিভ। ১৮) মেডিক্যাল কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক, কলেরার চিকিৎসায় ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইন ইঞ্জেকশনের যুগান্তকারী আবিষ্কারক এবং গাঁজা তথা ক্যানাবিসের মেডিক্যাল ব্যবহারের উদ্ভাবক **উইলিয়াম ব্রুক ও'শনেসি**। ১৯) ২৬ নম্বর রেডিমেন্টর সার্জেন উইলিয়াম বেল। ২০) উইলিয়াম গ্রাহাম। ২১) সার্জেন জে ম্যাক্সটন, সার্জন, ক্যালকাটা পুলিশ এবং কলকাতার মিন্ট ও কাস্টমস হাউসের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার (Crawford প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ.২৪০)। এবং ২২) **রিচার্ড ও'শনেসি**, মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক এবং যাঁর বিখ্যাত পুস্তক *On Diseases of the Jaws, with a brief outline of their surgical anatomy* (১৮৪৪)।

এঁদের মেডিসিনে বরফ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রধান যুক্তিগুলো ছিল এরকম---১) জ্বর কমাতে বিশেষ

এঁদের লেখা কয়েকটি চিঠির ছবি।

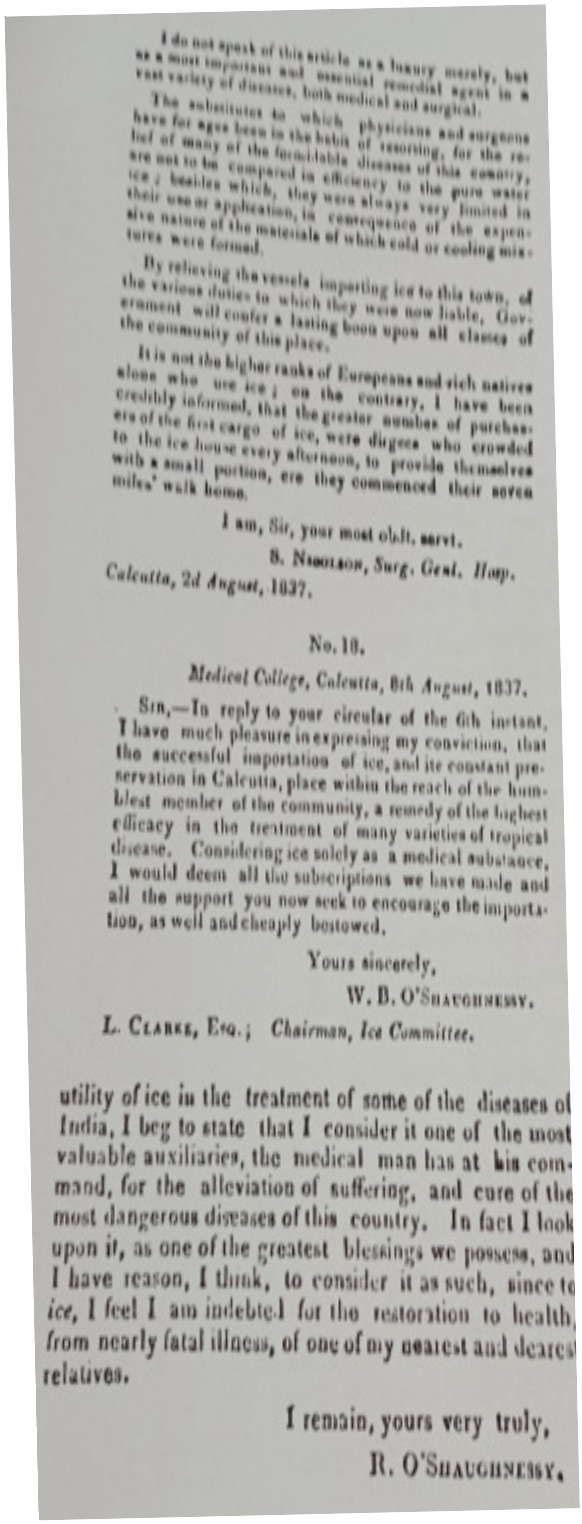

I do not speak of this article as a luxury merely, but as a most important and essential remedial agent in a vast variety of diseases, both medical and surgical.

The substitutes to which physicians and surgeons have for ages been in the habit of resorting, for the relief of many of the formidable diseases of this country, are not to be compared in efficiency to the pure water ice; besides which, they were always very limited in their use or application, in consequence of the expensive nature of the materials of which cold or cooling mixtures were formed.

By relieving the vessels importing ice to this town, of the various duties to which they were now liable, Government will confer a lasting boon upon all classes of the community of this place.

It is not the higher ranks of Europeans and rich natives alone who use ice; on the contrary, I have been credibly informed, that the greater number of purchasers of the first cargo of ice, were dirgees who crowded to the ice house every afternoon, to provide themselves with a small portion, ere they commenced their seven miles' walk home.

I am, Sir, your most obdt. servt.

S. Nicolson, Surg. Genl. Hosp.

Calcutta, 2d August, 1837.

No. 10.

Medical College, Calcutta, 8th August, 1837.

Sir,—In reply to your circular of the 6th instant, I have much pleasure in expressing my conviction, that the successful importation of ice, and its constant preservation in Calcutta, place within the reach of the humblest member of the community, a remedy of the highest efficacy in the treatment of many varieties of tropical disease. Considering ice solely as a medical substance, I would deem all the subscriptions we have made and all the support you now seek to encourage the importation, as well and cheaply bestowed.

Yours sincerely,

W. B. O'Shaughnessy.

L. Clarke, Esq.; *Chairman, Ice Committee.*

utility of ice in the treatment of some of the diseases of India, I beg to state that I consider it one of the most valuable auxiliaries, the medical man has at his command, for the alleviation of suffering, and cure of the most dangerous diseases of this country. In fact I look upon it, as one of the greatest blessings we possess, and I have reason, I think, to consider it as such, since to *ice*, I feel I am indebted for the restoration to health, from nearly fatal illness, of one of my nearest and dearest relatives.

I remain, yours very truly,

R. O'Shaughnessy.

সাহায্যকারী, বিশেষ করে রক্ত চলাচল যখন বেড়ে যায়, তখন সেটা কমাতে সাহায্য করে। ২) শিশুদের দাঁত ওঠার সময়ের জ্বরে কার্যকরী। ৩) 'internal inflammation-এর ক্ষেত্রে ফলদায়ক। ৪) 'soothes the sense of rending pain in the brain. ৫) 'strangulated hernia. ৬) 'in various disorders, both surgical and medical. ৭) 'most valiable in certain cases of mania...in cases of uterine hemorrhage. ৮) **উইলিয়াম ব্রুক ও'শনেসির মতো গবেষকের অভিমত এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য—'বরফকে পূর্ণত মেডিক্যাল সাবস্ট্যান্স হিসেবে বিবেচনা করলে, আমি মনে করি আমরা যে চিঠিপত্র লিখেছি এবং আপনারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তাতে বলা যায় এর আমদানি বাড়াতে উৎসাহ দিতে হবে যাতে সস্তায় জ্বরের চিকিৎসা করা যায়।'**[১৫]

১৮৫২ সালে মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র সূর্য গুডিভ চক্রবর্তী এপিলেপসি নিয়ে তাঁর একটি গবেষণাপত্রে বলেন—'আমি এটুকু কেবল আশা করি যে আমি যে রিপোর্ট পেশ করেছি সেটা আমার মেডিক্যাল বন্ধুরা পাঠ করে *সমধর্মী ক্ষেত্রে বরফের যথাযথ ব্যবহারের ইতিবাচক ফলাফল প্রত্যক্ষ করবেন।*'[১৬] তিনি নিজে এপিলেপসির ক্ষেত্রে বরফের ব্যবহার করে ইতিবাচক ফল পেয়েছিলেন। ফলে অন্যান্যদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা কি জানায়।

একেবারে সাম্প্রতিক সময়ের গবেষণা দেখিয়েছে—'বিলাস দ্রব্যের যে কোনো আইটেমের চেয়ে বরফকে বেশি বোঝা হয়েছিল ঔপনিবেশিক দেহকে রক্ষা করার একটি আয়ুধ হিসেবে। বরফের মাঝে ছিল একটি প্রতিশ্রুতি —*গরমের দেশে জাতিগত দীর্ঘস্থায়িত্ব রক্ষা করার সম্ভাবনা এবং ঔপনিবেশিক কর্তাব্যক্তিদের স্বাস্থ্য রক্ষা করার উপাদান।*'[১৭]

এভাবে সুদূর আমেরিকা থেকে রপ্তানি করা বরফ কলকাতায় পৌঁছে চিকিৎসা এবং পাবলিক হেল্‌থ তথা জনস্বাস্থ্যের একটি কার্যকরী হাতিয়ার হয়ে উঠল ১৮৩৩ থেকে ১৮৫২ সালের মধ্যে। এ এক কম জানা, চিত্তাকর্ষক ইতিহাস।

তথ্যসূত্র ঃ

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৩০-১৮৪০, পৃ.৩৫৭।

২. 'Ice-making in Bengal', *Penny Magazine of the Society for Diffusion of Useful Knowledge*, May 27, 1837, পৃ. ১৯৮।

৩. H.E.A. Cotton, *Calcutta Old and New*: A Historical & Descriptive Handbook to the City, 1907 পৃ. ১৮৭।

৪. Marc W.Herold, 'Ice in the Tropics: the Export of 'Crystal Blocks of Yankee Coldness' to India and Brazil', *Revista Espaco Academico*, No. 142 (March 2012), পৃ. ১৬২-১৭৭।

৫. *Calcutta Monthly Journal*, No. XXVII, 1st May, 1837, পৃ. ১১৮

৬. *ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল পত্রিকা* No.XXVII, 1st May, 1837, পৃ. ১১৯

৭. Cotton, *Calcutta Old and New*, পৃ. ১৮৬।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০।

৯. 'Ice-Making in Bengal', *Penny Magazine*, পৃ. ১৯৯।

১০. Cotton, *Calcutta Old and New*, পৃ. ১৯২।

১১. ওয়েটম্যান, প্রাগুক্ত, 'A Cool Cargo for Calcutta', Chapter 8.

১২. David G.Dickason, 'The Nineteenth-Century Indo-American Ice Trade: An Hyperborean Epic' *Modern Asian Studies*, Volume 25, Issue 01, February 1991, pp 53-89, পৃ. ৬৩।

১৩. *Calcutta Monthly Journal*, Third Series: Vol IV, 1838, পৃ. ২৭১।

১৪. Cotton, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯-১৯০।

১৫. *Calcutta Monthly Journal*, Third Series: Vol.IV, 1838, পৃ. ২৭৪।

১৬. 'A Singular Case of Epilepsy', *Medical Times and Gazette*, 5 (New Series, 1852), pp. 406-408, পৃ. ৪০৮।

১৭. ইশান আশুতোষ, 'Frozen Modernity: the Us-India ice trade and the cultures of colonialism,' *Cultural Geographies* 2023, 30 (3): 413-428.

উমা

ঘোষণা

স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড পার্সেলে যেসব গ্রাহক উৎস মানুষ পত্রিকা নেন তাঁদের পত্রিকা ও ডাক খরচ বাবদ বছরে ২২০ টাকা দিতে হয়। ডাক খরচ অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় আগামী জানুয়ারি ২০২৫ থেকে পূর্বোক্ত গ্রাহকদের জন্য বাৎসরিক গ্রাহক মূল্য ২৫০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। আশা করি প্রিয় গ্রাহকরা আগের মতোই আমাদের এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন।

বুড়ো বয়সের ভুলো মন ঃ বার্ধক্যে মনে রাখার অক্ষমতার সমস্যা

গৌতম মিস্ত্রী

হঠাৎ স্কুলের এক সহপাঠীর সঙ্গে দেখা— যাঁর সঙ্গে সাত বছর একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি, একসঙ্গে খেলেছি। মুশকিল হল, এতদিন পরে সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবার পর অতীতের প্রায় সব রোমাঞ্চকর এবং বিষাদের সব ঘটনা মনে পড়লেও, সেই বন্ধুর নাম মনে করতে পারছিলাম না। আলাপের প্রথমেই নাম জিজ্ঞাসা করা যেত, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আধঘণ্টা ধরে গল্পগুজব করার পরে নাম জিজ্ঞাসা করা লজ্জাজনক। তাঁর আগের স্মৃতি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার নাম বেশ মনে আছে। আমরা অনেকেই, যাঁরা যৌবনের গণ্ডি পেরিয়ে এসেছি, অতীতের কিছু ঘটনার কথা মনে রাখতে পারলেও পুরনো ঘটনার সব কিছু মনে রাখতে পারি না। অনেক সময়ে ঘটনার কথাও বেমালুম ভুলে যাই। গতকাল কোথায় যে চাবিটা সযত্নে (!) রেখেছি, আজ সকালে মনে করতে পারছি না। মানুষের মনে রাখার ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে তার মস্তিষ্কে জমা থাকে। হিসেবি লোকজন ডায়েরি লেখেন। অনেকে পুরনো ঘটনার খুঁটিনাটি সব স্মৃতি জমিয়ে রাখার জন্য নিজের মগজের উপরে ভরসা করেন না—ডায়েরিতে, ল্যাপটপে অথবা আকাশে (ক্লাউড স্টোরেজে) জমা রাখেন।

পুরনো স্মৃতি হুবহু মনে করার কৃতিত্বের জন্য মস্তিষ্কের তিনটি সক্ষম কর্মকাণ্ড দাবিদার। আমাদের চারপাশের কর্মকাণ্ড আমাদের চেতনায় আঘাত করে (sensation)। প্রথমে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নাগালে ঘটে যাওয়া ঘটনা হিসাবে বইয়ের পাতায় লেখা তথ্য, রেডিও-টেলিভিশন-স্মার্ট ফোন-বায়স্কোপের বিনোদন বা তিক্ত অনুভব—এমনকি সমস্ত শ্রবণযোগ্য এবং দৃশ্যমান অযান্ত্রিক ও যান্ত্রিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আলোক ও শব্দ তরঙ্গ ব্যক্তি মানুষের ইন্দ্রিয়ে চেতনার অনুভব সৃষ্টি করে। এই সুবিশাল চেতনার ঢেউ ব্যক্তি তার ক্ষমতা, মনোযোগ ও অগ্রাধিকার অনুযায়ী অনুভব করেন। স্মৃতি হিসাবে পরে পুরনো তথ্য বা স্মৃতি মনে করার জন্য প্রথম কর্মকাণ্ড হিসাবে চেতনায় ধরা ঘটনার তথ্য মস্তিষ্কে অনুভূতি হওয়া পরে আরও মস্তিষ্কের কাজ অপরিহার্য।

দ্বিতীয়ত, সেই প্রাথমিক অনুভব বা তথ্য নির্ভরযোগ্যভাবে আমাদের মস্তিষ্কে জমা হওয়া (registration) দরকার, ও তৃতীয়ত, পরে প্রয়োজন মতো সেই অনুভব বা তথ্য খুঁজে পরবর্তী কোনো প্রাসঙ্গিক সময়ে ব্যবহার করা (retrival) প্রয়োজন। তিনটি ঘটনার প্রথমটি স্বতঃস্ফূর্ত। অক্ষম ইন্দ্রিয় না থাকলে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমাদের চারপাশের বিশ্বের ছবি, তথ্য ইত্যাদি আমাদের মস্তিষ্কে চেতনার ঢেউ তোলে। সেই অনুভব বা তথ্য আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও আমাদের মনোযোগ অনুযায়ী ও সেই সময়ে আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছনো অজস্র চেতনার ঢেউয়ের (sensation) মধ্য থেকে কয়েকটা সংরক্ষণ করতে পারে। সব চেতনাকে 'মনে রাখার মতো করে' আধুনিক বুদ্ধিমান (হোমো সেপিয়েন্স) মানুষ মস্তিষ্কে জমিয়ে রাখতে পারেন না। মানুষের মস্তিষ্কে তথ্য জমিয়ে রাখার একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এই সীমাবদ্ধতা আছে বলেই বুদ্ধিমান মানুষ তথ্য সংরক্ষণের জন্য আজকাল নিজের ও নিজের প্রজাতির উপরে নির্ভর করেন না। আধুনিক মানুষ তথ্য সংরক্ষণের জন্য কাগজ-কলম, ছাপাখানা, কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক, পেন ড্রাইভ অথবা আন্তরজালে পেশাধারী তথ্য সংরক্ষণের (ক্লাউড ড্রাইভ স্টোরেজ) উপরে নির্ভর করেন।

সামাজিক প্রয়োজনে যখন তখন আমাদের স্মৃতির নাগালের বাইরের উপায়ে অর্থাৎ মগজে বাইরের তথ্য সংরক্ষণের অপ্রতুল উপায়ের সীমাবদ্ধতা আমাদের অপ্রস্তুত করে তোলে অনেক সময়ে। স্কুলের বন্ধুকে নাম ধরে ডাকার জন্য ডায়েরি খুলে মিনিট পাঁচেক পরে তাঁকে নাম ধরে ডাকলে সেই বন্ধু মোটেই খুশি হবেন না। এই সমস্যা তীব্র হয় বয়সের ভারে। বুদ্ধিমান মানুষ বৃদ্ধ/বৃদ্ধা হলে তার মগজের কর্মদক্ষতা ক্ষীণ হয়। যতটুকু কর্মদক্ষতা টিকে থাকে, সেটা প্রাসঙ্গিক ও নিয়মিত চর্চিত বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে। বহুদিন পরে হঠাৎ দেখা সহপাঠীর নাম মনে রাখার জন্য প্রবীণ মানুষের মগজ মোটেই প্রস্তুত থাকে না। অনেক জাগতিক বিষয়ে মানব-মন তার সীমাবদ্ধতা মেনে মানুষের পাশে থাকে। বৃদ্ধ মানুষের কাছে সামাজিক দেখনদারি, কম কাজের বা অকাজের তথ্য তাঁর মগজের হিসাবে অপাংক্তেয় থেকে যায়।

প্রাথমিকভাবে এই ভুলে যাওয়ার দুটি স্তর আছে। প্রথম

স্তরটা স্বাভাবিক, রোগ নয়—বার্ধক্য। ইন্দ্রিয়ের আর মস্তিষ্কের কোনো রোগ না হলেও কালের অমোঘ নিয়মে, এন্ট্রপি[১] বেড়ে যাওয়ার কারণে, আধুনিক মানুষের মগজ তাঁর জীবনের তিন দশকের পর থেকে ক্ষয় হতে থাকে। তারই ফলস্বরূপ বেশি বয়সের বিনা-রোগের ভুলো মনের রোগ। এটার জন্য আক্ষেপ করতে নেই। এটার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। সেটা মোকাবিলা করার আলোচনার আগে স্বল্প কথায় স্মৃতি বিস্মরণের প্রধান প্রধান রোগের উল্লেখ করা দরকার। এই রোগগুলো অবশ্যম্ভাবী নয়।

যে রোগগুলো মাঝ বয়সের পরে মানুষের মস্তিষ্ক পুরনো ও নতুন স্মৃতি বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞান সাময়িকভাবে অথবা পাকাপাকিভাবে ভুলে যায় তার দুটো মূল শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণীর রোগই প্রধান, মস্তিষ্কের কোষ, না নিউরনের ক্ষয়রোগ (neurodegenerative disorder)। উদাহরণ--- অ্যালঝাইমার্স ডিজিজ ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নামধারী নিরাময়ের অযোগ্য রোগসমূহ, যেমন--- লেউই বডিজ (Lewy bodies), পারকিন্সন ডিজিজ, ডাউন সিন্ড্রোম ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্রেণী, সংখ্যার হিসাবে দ্বিতীয়— মস্তিষ্কের রক্তনালীর রোগ বা ভ্যাস্কুলার ডিমেন্সিয়া।

মনে রাখার অক্ষমতা নিয়ে অ্যালঝাইমার্স ডিজিজের নামটা বেশি শোনা যায়, যা একটি জিনবাহিত রোগ (autosomal-dominant), সাধারণত ৬০ বছর বয়সের পরে প্রকাশ পায়। ৬৫ বছর অতিক্রম করার পরে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এর প্রাদুর্ভাব দ্বিগুণ হতে থাকে। ক্রমবর্ধমান বুড়ো মানুষে ভরে ওঠা পৃথিবীতে ভুলো মনের রোগের প্রাদুর্ভাব সেই কারণেই বাড়ছে।

সাময়িক স্মৃতি বিস্মরণের সমস্যাগুলিকে ফেলে আসা অতীত কালের তিনটি গণ্ডিতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, সবেমাত্র অনুভূত বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভুলে যাওয়া। যেমন—এইমাত্র শোনা ফোন নম্বর সঠিক মনে না করতে পারা অথবা হলঘর থেকে কিছু একটা আনতে শোবার ঘরে এসে কী আনতে এলাম সেটা মনে করতে না পারা। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিক অতীতের ঘটনার কিছু কিছু ঘটনা ভুলে যাওয়া—গত মাসে পুরী বেড়াতে গিয়ে একটা পুরনো গান শুনেছিলাম, সেই গানের কলি মনে করতে পারছি না, অথবা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার সময়ে, 'ঐ যে আলমোড়া পাশের একটা পাহাড়ে একটা ফরেস্ট রেস্ট হাউস আছে না? কী যেন তার নাম (বিন্‌সার নাম মনে পড়ল আধঘণ্টা পরে)' এই রকমের। তৃতীয়ত, বহুদিনের পুরনো স্মৃতি মনে না করতে পারা, যেমন— হাই স্কুলে আমরা পাঁচ বন্ধু একসাথে ওঠাবসা করতাম, তাঁদের তিনজনের নাম মনে আছে, একজনের নাম মনে নেই/ অথবা আমাদের জোটে যে পাঁচজনই ছিলাম, চারজন নয়, সেটাও খেয়াল পড়ছে না। এই তিন শ্রেণীর স্মৃতি মস্তিষ্কের আলাদা আলাদা অংশে জমা থাকে। সদ্য ঘটনার স্মৃতি মস্তিষ্কে হিপোক্যাম্পাস ও কর্টেক্সে জমা থাকে, স্মৃতি একটু বাসি হলে (স্মৃতি তখন আর তরতাজা নয়) ফ্রন্টাল লোবের সামনের অংশে (prefrontal) জমা হয়।

অ্যালঝাইমার্স রোগে প্রথম দুই ধরনের সাময়িক স্মৃতি বিস্মরণের সমস্যা প্রথমে প্রকাশ পায়। এই রোগের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, প্রায় অনেক কিছু মনে রাখতে পারলেও বিশেষ বিশেষ কালের বিশেষ বিশেষ স্থানের কিছু ঘটনা কিছুতেই মনে আসে না। যেমন, একজন ক্লাসমেট একটা ছবি দেখিয়ে বলল, মনে আছে, তোর এই ছবিটা আমি তুলেছিলাম যেদিন তুই কলেজের বিচিত্রানুষ্ঠানে গান গেয়েছিলি (Loss of declarative episodic memory, memory of events occurring at a particular time and place)। এই রকম হতে থাকলে, সময়ের সাথে সাথে মানসিক অবসাদ, জাগতিক বিষয়ে ঔদাসীন্য আমাদের গ্রাস করে, অতি সাধারণ কর্মকুশলতা (যেমন চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানো, খোঁপা বাঁধা) আগের মতো করে করা যায় না।

সন্দেহ হলে সহজেই এমন ব্যক্তির মনে রাখার ক্ষমতা পরীক্ষা করা যায়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক— কিছুক্ষণ পরে মনে করতে হবে এই বলে ক্রমান্বয়ে ৬ থেকে ১০টি, ছকে বাধা নয়, এমন সংখ্যা বা শব্দ বলতে হবে অথবা দেখাতে হবে কিছু বস্তু (যেমন চাবি, কলম, পয়সা, মোবাইল ফোন ইত্যাদি) ও ৫ থেকে ১০ মিনিট পরে সেটা মনে আছে কিনা জানতে হবে। ক্রমাগত মুখস্থ করা ঠেকানো গেলে স্মৃতি বিস্মরণের রোগাক্রান্ত মানুষরা এই পরীক্ষায় ফেল করবেন। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' সিনেমার মতো অত কঠিন 'মেমরি গেম'-এ হেরে যাওয়া অবশ্য স্বাভাবিক মানুষেরও হয়।

অ্যালঝাইমার্স রোগ ও সমগোত্রীয় রোগের পরে ভুলো মনের রোগের পরে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রোগের নাম ভ্যাস্কুলার ডিমেন্সিয়া—মস্তিষ্কের রক্তনালীর অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক (atherosclerotic) রোগ। রোগ লক্ষণের বিশালতার জন্য নিজের থেকেই জানান দেওয়া ব্রেন স্ট্রোক ছাড়াও এক বিশাল সংখ্যক মানুষ প্রচ্ছন্ন ও ক্রমাগত ছোট আকারের স্ট্রোকে

আক্রান্ত হতে থাকেন অগোচরে। সেটা স্থানীয়ভাবে মস্তিষ্কের রক্তনালীর রোগ থেকে যেমন হতে পারে আবার কিছু হৃদরোগেও হতে পারে। যেমন, স্থায়ী বা ঘন ঘন অস্থায়ী ক্ষণিকের এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন নামের হৃদপিণ্ডের ছন্দপতনের রোগ, অথবা প্রতিস্থাপিত কৃত্রিম ভাল্‌ভের কৃত্রিমতার বেদনাদায়ক মূল্য। এই রোগগুলোতে হৃদপিণ্ডে ছোট ছোট রক্তের ডেলা (micro-emboli) তৈরি হয় ও রক্তে ভেসে মস্তিষ্কের রক্তনালীতে আটকে যায়। এই সমস্যা ঠেকানোর অবশ্য ওষুধপত্র আছে। তবে সেই চিকিৎসা ১০০ শতাংশ সুরক্ষা দেয় না। যেটুকু সুরক্ষা দেয়, সেটা পাওয়া যায় সেই ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আপসের বিনিময়ে।

ভুলো মনের চিকিৎসা

প্রথমে বুঝে নিতে হবে, ঘুমের ওষুধ ছাড়াই ঘুমানো যায় কিনা। সব ঘুমপাড়ানোর ওষুধই আমাদের মস্তিষ্ককে কিছুটা অচেতন করে রাখে জেগে থাকার সময়েও। মনোরোগের ওষুধও তেমনটাই করে। ডাক্তারের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করে নেওয়া দরকার, যাতে অদরকারি মনোরোগের দাওয়াই যতটা সম্ভব কম করা যায়। মদ্যপান ত্যাগ করতে না পারলে মানুষের মহার্ঘ ধন, তার মননের অকাল বার্ধক্যের আঘাত মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এটাও জেনে রাখা ভাল, মনে রাখার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কোনো ওষুধ নেই। যে রোগের কাজের কোনো ওষুধ থাকে না তার জন্য হরেক রকমের অকাজের ওষুধ বাজারে বিক্রি হয়। সব রকমের অকাজের ওষুধ বেশ দামি হয়।

মস্তিষ্কের কোষ, না নিউরনের ক্ষয়রোগের ক্ষেত্রে (অ্যালঝাইমার্স ডিজিজ) কোনো কাজের ওষুধ না থাকলেও মস্তিষ্কের রক্তনালীর রোগ বা ভ্যাস্কুলার ডিমেন্সিয়ার কিছু ওষুধ ব্যবহার করতে হয়, ক্রমবর্ধমান ক্ষতি এড়ানোর জন্য। মস্তিষ্কের রক্তনালীর রোগ যখন ভুলো মনের কারণ, তখন শরীরের অন্য অঙ্গের রক্তনালীর রোগে (যেমন হৃদরোগ ও হার্ট অ্যাটাক) প্রযুক্ত কাজের ওষুধের প্রয়োগ ভ্যাস্কুলার ডিমেন্সিয়ার অগ্রগতি রোধ করতে পারে। এই সব ওষুধ বা বৃহদার্থে চিকিৎসা (ওষুধ ও স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলী) রক্তনালীর রোগের উপাদান (রিস্ক ফ্যাক্টর) স্বরূপ উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, রক্তে উচ্চ মাত্রার লঘু ঘনত্বের কোলেস্টেরল, তামাকের ব্যবহার, শরীরচর্চার ঘাটতি আর স্থূলতাকে নিশানা করে। আপাত নিরীহ, নীরবে ঘটে যাওয়া এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন নামের ছন্দপতনের রোগে জমাট বাধা নিবারণকারী অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট ওষুধের ব্যবহার অত্যন্ত কাজের। রক্ত জমাট বাধা নিবারণকারী এই ওষুধগুলো অ্যাসপিরিন নয়, এগুলো অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট। অ্যাসপিরিন ও সমগোত্রীয় ওষুধও রক্ত জমাট বাধতে বাধা দেয় রক্তের অণুচক্রিকাকে নিষ্ক্রিয় করে। অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট একই কাজ করে রক্ত জমাট বাধার জন্য অপরিহার্য কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরকে (প্রোটিন) নিষ্ক্রিয় করে। এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন রোগে অ্যাস্পিরিন নয়, অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট নিশ্চিতভাবে অধিকভাবে অধিক সফল বলে প্রমাণিত।

ভুলোমনের রোগ অ্যালঝাইমার্স ডিজিজ না ভ্যাস্কুলার, এটার ব্যবচ্ছেদ ততটা দরকারি নয় ব্যক্তি বিশেষের চিকিৎসার জন্য। এই বিচার গবেষণার জন্য হয়ত হতেই পারে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভুলোমনের রোগীদের রক্তনালীর রোগ, অর্থাৎ ভ্যাস্কুলার ডিমেন্সিয়া মনে করে নিয়ে চিকিৎসা করলে ক্ষতি নেই, লাভ হলেও হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, রক্তে উচ্চ মাত্রার লঘু ঘনত্বের কোলেস্টেরলের চিকিৎসার সাথে সাথে তামাকের ব্যবহার বন্ধ করা, শরীরচর্চার ঘাটতি পূরণ আর স্থূলতা হ্রাস রোগলক্ষণওয়ালা রোগী বা রোগলক্ষণহীন আপাতসুস্থ— সব মানুষের, সব বয়সে চিকিৎসায় প্রাসঙ্গিক। মন সতেজ বা নিস্তেজ, যাই-ই হোক না কেন, সেই চিকিৎসার কথা খবরের হেডলাইন হওয়া উচিত, সেই চিকিৎসা লাইমলাইটে আসার সঙ্গত দাবি রাখে।

একটা আশার কথা, ক্রমক্ষয়িষ্ণু মস্তিষ্কের কোষকলার বেশ কিছু অংশ অব্যবহৃত থাকে বুড়ো বয়সেও। সিনেমা-সিরিয়াল-ক্রিকেট খেলা ইত্যাদি বিনোদনে সময় কাটানোতে মগজের অনুশীলন হয় না। অবসরকালে অফুরন্ত, একঘেয়ে সময়ে বিনোদনের উপায় ভেবেচিন্তে নির্বাচন করা জরুরি। গান শেখা, শব্দ-ছক সমাধান, অঙ্কের সমাধান, ডায়েরি লেখা বা নিজের পছন্দের বিষয়ে রচনা, কবিতা ইত্যাদি লেখা— এমনকি কিছু ধরনের তাস খেলা (ব্রিজ, সলিটেয়ার) ইত্যাদি বিনোদনের উপায়ে মস্তিষ্কের অব্যবহৃত অংশের চর্চা হয়। ২০ থেকে ২৫ ঘরের নামতা অপেক্ষাকৃত সহজ। আপনি বরং ২৪ ঘরের নামতা মনে মনে সমাধান করুন, তারপরে ২৯ ঘরের নামতা। এতে মনের ভাল ব্যায়াম হবে। মনের ব্যায়াম নিয়মিত করতে থাকলে মনে রাখার ক্ষমতা ধরে রাখা যায় ও বাড়ানো যায়। সঙ্গীসাথী থাকলে একসঙ্গে বা একলা হলেও নিয়মিত সৃষ্টিশীল (গান শেখা, ছবি আঁকা ইত্যাদি) কাজে অবসর সময় কাটাতে পারলে সেই বিষয়ে পারদর্শী

হওয়া যায় যে কোনো বয়সে। শরীরের ব্যায়ামে যেমন পেশি শক্তিশালী হয়, মনের ব্যায়ামে মন সতেজ থাকে, প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্মৃতি হাতড়াতে হয় না। **কিছু আপোস** —যতটা প্রয়োগ করা যায়, সব কিছু প্রয়োগের পরেও বৃদ্ধ বয়সে মনের শান যৌবনের মতো ক্ষুরধার হয় না। তখন আপসের দরকার হয়। অনেকদিনের শখ, একটা গান শোনার কানে গোঁজা যন্ত্র কিনেছেন (ব্লু টুথ ইয়ার বাড), কারণ আপনার বৃদ্ধ জীবনসঙ্গী, স্বামী বা স্ত্রী আপনার শখের গান শুনতে চান না। সেই যন্ত্রটা কোথায় রেখেছেন, খুঁজে পাচ্ছেন না, যদিও বেশ যত্ন করেই সেটি রেখেছেন যাতে সেটি খোয়া না যায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, মাঝ বয়সের পরে কাজের ছোটখাটো জিনিসপত্র গোপন জায়গায় রাখবেন না। গোপন জায়গার সন্ধান চোর খুঁজে পেলেও আপনি হয়ত সেই জায়গার কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। জিনিসটা হয়ত মহার্ঘ নয়, আর একটা হয়ত কিনে নিতেই পারেন। কিন্তু খুঁজে না পাওয়ার ব্যথা মানসিক। এতে শারীরিক কষ্ট আরও বেড়ে যায়।

সূত্র : ১) স্বচিকিৎসা পর্ব ৬ — তস্য পর্বঃ বার্ধক্য ১, https://www.utsomanush.com/Magazines/UM-Patrika-Apr-Jun2022.pdf, পৃষ্ঠা ১৫। উমা

অরণ্য তুমি কার?
কালাকাদ-মুন্দান্থুরাই টাইগার রিজার্ভের অভিজ্ঞতা

শান্তনু গুপ্ত

কালাকাদ-মুন্দান্থুরাই টাইগার রিজার্ভ (কেএমটিআর)-এর নাম শুনেছেন? আমি নিশ্চিত যাঁরা অফ বিট ট্রাভেলার তাঁদের অনেকে বিশেষ করে উত্তর আর পূর্ব ভারতের মানুষেরা এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের (প্রোটেক্টেড এরিয়া) নাম শোনেন নি। বাংলার ভ্রমণ পিপাসু এবং জঙ্গল ভালবাসেন তাঁরা হয়ত নাম শুনেছেন বান্দিপুর, মুদুমালাই, নাগারহোল বা কাবিনি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের নাম। কিন্তু কালাকাদ-মুন্দান্থুরাই অরণ্য? এই সংরক্ষিত অরণ্য ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার একদম শেষ বিন্দুতে তামিলনাড়ু আর কেরালা রাজ্যের প্রান্ত বরাবর অবস্থিত। কালাকাদ-মুন্দান্থুরাই উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের স্বর্গরাজ্য।

এই অরণ্যের পূর্বদিকে তামিলনাড়ু আর পশ্চিমদিকে কেরালা রাজ্যের সীমানা। ধাপে ধাপে সমুদ্রতল থেকে উঠে গেছে ১৮৬৬ মিটার উচ্চতায় (Johnsingh 2001)। প্রত্যেক ধাপে প্রকৃতি রূপ বদলে ফেলছে। সেই সঙ্গে বদলে যাচ্ছে জঙ্গল। একদম নীচে কাঁটাওয়ালা একাশিয়ার ঝোপ, কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে কোনো নদীর ধারে পৌঁছলেই পাওয়া যাবে ঘন সবুজ মোটা পাতাওয়ালা চিরহরিৎ অরণ্য (riverine forest)। এরপর পাহাড়ের ঢাল বরাবর মুন্দান্থুরাই মালভূমি, তখন দেখা যাবে শুষ্ক পর্ণমোচী জঙ্গল। ঠিক যেন মালভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য তৈরি করেছে। দেখা যাবে সেগুন, ধাওড়া, সাটিন গাছ, তেন্দু, রেড সিডার আর কাথ বের। এরপর ১৫০০ থেকে ১৮০০ মিটার উচ্চতায় পাড়ি দিলে পাহাড়ের পাদদেশে যখন ৪০ ডিগ্রির চাঁদি ফাটা গরম, পাহাড়চূড়ার চিরহরিৎ নিরক্ষীয় অরণ্যে তখন অনেক জায়গায় সূর্যের আলো প্রাবেশ করতে পারে না। সেখানে তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি হয়ে যায়। ভারতবর্ষে অরুণাচল প্রদেশ, আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, আরব সাগরের তটবর্তী কিছু অঞ্চল ছাড়া পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কিছু জায়গায় পাওয়া যায় এরকম গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রেইন ফরেস্ট। Dipterocarpus, Elaeocarpus, Mesua, Hopea, Garcinia, Xanthophyllum প্রজাতির গাছ এই অরণ্যে রয়েছে, যেসব গাছের উচ্চতা অন্তত ১৫ থেকে ২০ মিটার উঁচু। মাটির কাছাকাছি এইসব বড় বড় woody tree-র গায়ে ঝুলে আছে অজস্র লায়েনা আর ক্লাইম্বার। এই অরণ্য ভারতের অমূল্য সম্পদ। কেএমটিআর-এর এই বৃষ্টি অরণ্য শুধু উদ্ভিদবিদ নয়, প্রাইমেটোলজিস্টদেরও স্বর্গরাজ্য। বিপন্ন প্রজাতির lion-tailed macaque ছাড়াও এই রেইন ফরেস্ট Nilgiri Langur আর Slender loris-এর আশ্রয়স্থল। এই অরণ্যের মধ্যভাগে পাহাড়ি পথ ধরে গেলেই পৌঁছে যাওয়া যায় কাকাচির শতাব্দী প্রাচীন বম্বে বার্মা ট্রেডিং কোম্পানির চা আর কফি বাগান- স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডের মতন। এর চারিদিক ঘিরে পশ্চিমঘাটের বিখাত শোলা ফরেস্ট। ঘাস জমির মাঝে মাঝে দাক্ষিণাত্যের typical tropical montane forest. এখানে মাঝে মাঝে দেখা যায় নীলগিরি টার বা পশ্চিমঘাটের বন্য ছাগল। এটিও বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী। এই সংরক্ষিত অরণ্যের ভেতরে সেঙ্গেলথেরি বৃষ্টি অরণ্যে পৌঁছলে মনে হবে না যে, এটা নিরক্ষরেখার কাছাকাছি। গহীন অরণ্যে হিমালয়ের ঠাণ্ডা অনুভব

হবে। প্রায় ৯০০ কিলোমিটারের এই টাইগার রিজার্ভে ১২ রকমের আলাদা ধরনের অরণ্য আছে (Champion and Seth, 1968)। গোটা পশ্চিমঘাট পর্বতমালা জুড়ে প্রায় ৪০০০ বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের গাছ পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রায় ১৫০০টি পাওয়া যাবে তামিলনাড়ুর কেএমটিআর অরণ্যে (Parthasarathy 2001)। এর সাথে রয়েছে বাঘ, লেপার্ড আর হাতি। শুধু জীববৈচিত্র্য নয়, কেএমটিআর অরণ্য তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলি জেলার সেচের জলের উৎস স্থল বা সাপ্লাই লাইন। দেশের দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত এই জেলাটি শুষ্ক গরম অঞ্চল। কিন্তু এই তিরুনেলভেলিই rice bowl of southern India. এটা কি ভাবে সম্ভব হল? এটা সম্ভব হয়েছে এই জেলায় কালাকাদ-মুন্দান্থুরাই টাইগার রিজার্ভ আছে বলেই। এই অরণ্য ১২টি ছোট-বড় নদীর উৎসস্থল। এটাকে অনেকে রিভার স্যাংচুয়ারিও বলে। এর মধ্যে বিখ্যাত হল তাম্রপরনি নদী, যার উল্লেখ অনেক প্রাচীনসংস্কৃত সাহিত্যেও পাওয়া যায়। ১২৮ কিলোমিটার লম্বা তাম্রপরনি নদী আরও কয়েকটি সহযোগী নদীর সঙ্গে মিলে এই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পলি দিয়ে তিরুনেলবেলির পূর্বদিকের মাটিকে উর্বর করেছে। এই নদীগুলো থেকে সারা বছর ক্যানালে ক্যানালে সেচের জল চাষিদের কাছে পৌঁছে যায়। তাই তিরুনেলভেলি জেলায় বছরে তিনবার ধান চাষ হয় যা এরকম শুষ্ক আবহাওয়ার অঞ্চলে বিরল। পাশের মাদুরাই জেলার ভূপ্রকৃতি মরুভূমির মতন। মাইলের মাইলের পর শুধু কাঁটা ঝোপ। এটাই হল তিরুনেলভেলি জেলার ভূপ্রকৃতি,, বাস্তুতন্ত্র আর কৃষি অর্থনীতিতে কেএমটিআর-এর ভূমিকা।

কিন্তু ভারতের অন্য সব সংরক্ষিত অরণ্যের মতোই এই Gem of Southernmost Western Ghats-কে টিকিয়ে রাখা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এর পশ্চিমদিকের ঘন বৃষ্টি অরণ্যে কেরালা থেকে পোচাররা হানা দেয় চন্দন আর অন্যান্য দামি কাঠের জন্য। দামি গাছের ডাকাতি হয়। অরণ্যের পূর্বদিকে বাফার জোনে ১৫০টার বেশি গ্রাম রয়েছে। সেখান থেকে গরীব মানুষ এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার জন্য ঢোকে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা হিসাব অনুযায়ী (Annamalai 2004) আজ থেকে ১০-১৫ বছর আগেও এই টাইগার রিজার্ভে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩২২৫ জন মানুষ জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে দোকানে আর বাড়ি বাড়ি বিক্রি করে সংসার চালাত। গরিব মানুষের জীবন আর জীবিকা যেখানে জ্বালানি কাঠ কেটে বিক্রি করার ওপর নির্ভরশীল, সেখানে টাইগার রিজার্ভে না ঢোকার সরকারি নিয়ম, জেল বা ফাইন কোনো কিছুই তাদের সেখানে ঢোকা আটকাতে পারে না। নির্বিচারে পাহাড়ের পাদদেশ আর মালভূমির অরণ্য এভাবে ধ্বংস হচ্ছিল। গাছ কাটার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা গরু ছাগল চরাতেও টাইগার রিজার্ভে ঢুকতেন। বন্য হরিণের খাদ্যাভাব শুরু হয়েছিল আর সেই সঙ্গে শুরু হয়েছিল গবাদি পশুর থেকে অসুখ। তা থেকেই লেপার্ড আর টাইগারের উপযুক্ত বিচরণভূমি আর খাদ্যের জন্য হরিণের অভাব। এটা শুধু কেএমটিআর-এর কাহিনী নয়—রণথম্ভর, গির, কাজিরাঙ্গা কিংবা সিমলিপাল অরণ্যেও এই একই চিত্র। একদিকে জ্বালানি কাঠ, তেন্দু, ওষধি, ফল, গবাদি পশুর খাবারের জন্য গরীব মানুষের অরণ্য নির্ভরতা। অন্যদিকে বন্য জীবজন্তুর সংরক্ষণ। কোন্ সমস্যাটা আগে মেটানো হবে? আর কিভাবেই বা মিটবে? দরিদ্ররা দৈনন্দিন বেঁচে থাকার জন্য জঙ্গল কাটছে, জঙ্গল আর বন্যজীব শেষ হয়ে গেলে গরীব বাঁচবে না। একে অন্যকে জড়িয়ে আছে। এমন নয় যে, অরণ্যের পাশে থাকা মানুষেরা অরণ্যের গুরুত্ব বোঝে না। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জীবিকার নির্ভরতা তাদের নিরুপায় করেছে।তাই এই জটিল সমস্যার চটজলদি কোনো সমাধান নেই। তবুও তামিলনাড়ু বনদপ্তর সমাধানের জন্য Eco-development Project নিয়ে এসেছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক অর্থের জোগান দিল, বিশেষজ্ঞ আর গবেষকদের পরামর্শ চাওয়া হল। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এই প্রবন্ধ পাঠকদের কাছে পেশ করা।

তথ্যসূত্র :

Annamalai, R. (2004). Eco Development in Kalakad Mundanthurai Tiger Reserve, India. Status Report. Tamil Nadu Forest Department. 253p.

Parthasarathy, N (2001). Changes in forest composition and structure in three sites of tropical evergreen forests around Sengaltheri, Western Ghats. Current Science. 80: 389-393.

Champion, H.G. and S.K. Seth, (1968). A revised survey of the forest types of India. Government of India Press, New Delhi, India. 404p.

Gupta, S. and Mishra, B.K. (1999). Quantification of Anthropogenic Pressure in Kalakad-Mundanthurai Tiger Reserve. Gupta, S. and Mishra, B.K. (1999). 426p

Johnsingh A.J.T. (2001). The Kalakad-Mundanthurai Tiger Reserve: A global heritage of biological diversity. *Current Science* 80(3): 378-388

(চলবে)

উমা

আশীষ মুখার্জী (১৯৪০-২০২৪)

সেলাম আশীষদা

রানা খান

১৯৭৯ সালে সদ্য মাধ্যমিক পাশ করা ছেলে হঠাৎ ঠিক করল জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে একটা পোস্টার প্রদর্শনী করবে রাস্তার ওপর। কালো চার্ট পেপারে হাতে আঁকা রঙিন গোটা পঁচিশেক পোস্টার কয়েক মাসের প্রস্তুতিতে সেটা করা গেল রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর মূল গেটের উল্টো দিকের ফুটপাথের ওপর ল্যাম্প পোস্টের মধ্যে দড়ি টানিয়ে, তাতে পোস্টার ঝুলিয়ে। সারাদিন অনেক মানুষ সেটা দেখলেন, তার মধ্যে একজন একটা চিরকুটে তার নাম ও ফোন নম্বর দিয়ে বলেছিলেন, প্রয়োজন পড়লে যোগাযোগ করতে।

আমার আকাশ প্রেমের হাতেখড়ি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক সাজ্জাদ জাহির আদনানের কাছে। সম্পর্কে আমার ছোটমামা। এর পরেই দ্বিতীয় একজন আকাশপ্রেমীর সাক্ষাৎ পেলাম, ইংরাজির অধ্যাপক গৌরীপ্রসাদ ঘোষ। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তাঁর মিল্ক কলোনির বাড়িতে সুযোগ পেলেই ঢুঁ মারতাম। তিনি একবার আমায় বলেছিলেন, ফুলবাগানে স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংস্থা আছে। কিন্তু তার ঠিকানা কখনই বলেন নি। আমিও কোনো উৎসাহ দেখাই নি। ১৯৮৬ সালে হ্যালির ধূমকেতুর আগমন আমাকে টেনে এনে ফেলল ওই সংস্থা আয়োজিত দুই রাতব্যাপী বিড়লা মিউজিয়ামে 'হ্যলির ধূমকেতু উৎসবে'। ওই উৎসবে আশীষদা ও জয়াদির সাথে আলাপ হল, তারপর প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় সরকার বাজারের দোতলায় একটা ছোট ঘরে যেতে শুরু করলাম। এর আগে গৌরীদার সহযোগিতায় আমার হাতে তৈরি দু ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীন নিয়ে একাই নানা জায়গায় আকাশ দেখাতে ছুটে বেড়াতাম। এখন সেটা হয়ে গেল স্কাই ওয়াচার্স-এর অনুষ্ঠান, সঙ্গে যোগ দিতে থাকলেন অনেকেই — আশীষদা, স্বপন, মানস, কৃশানু, সৌমেনবাবু ও আরো অনেকে। এর আগে আমরা সবাই যে যার নিজের মতো স্কাই ওয়াচার ছিলাম। আশীষদার হ্যালির ধূমকেতু উৎসব আমাদের স্কাই ওয়াচার্স করে দিল।

জাহাজে চাকরির সূত্রে আশীষদা বছরের চার মাস ডাঙ্গায় থাকতেন। এই উৎসবের আগে সেই সময়টুকু সংগঠনটা নড়াচড়া করত, বাকি সময় তালাচাবি। উৎসবের পরে লোকবল বেড়ে যাওয়াতে সারা বছর আমাদের প্রোগ্রাম চলতে থাকল। স্কাই ওয়াচার্সের তৎকালীন সক্রিয় সদস্যদের মধ্যে ৭০ শতাংশ দক্ষিণ কলকাতা নিবাসী হওয়ায় ও কাজের সুবিধার জন্য সংগঠনের ঠিকানা ঢাকুরিয়ায় সৌমেনদার বাড়িতে নিয়ে গেলে, আশীষদা মনে করলেন তাঁর প্রাণাধিক সংগঠন বোধহয় হাতের বাইরে চলে গেল। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন বলে, আমাকে মূল হোতা ধরে, সেই অভিমানের কথা জানিয়েছিলেন। তাঁর নানারকম সমাজমনস্ক কাজে জড়িয়ে থাকা, আমি সবসময় শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতাম/দেখি বলে কখনই তাঁর মতান্তরকে মনান্তরে পরিণত হতে দিই নি। অবশ্য আশীষদাও সেটা জানতেন। সেজন্য ২০১৩-তেও একটা অনুষ্ঠানের পরে ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দেবার সময় দুজনের দীর্ঘ আলাপচারিতায় সেটা মনে করিয়ে দেওয়াতে আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল। এতদিন পরেও আশীষদার কাছে ঠিক সেইরকমই থেকে গিয়েছি। মাঝে তিনি অনুসন্ধিৎসা, মণীন্দ্র নারায়ণ লাহিড়ী ট্রাস্ট, কলকাতা অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টার, দত্তপুকুরের বিজ্ঞান কেন্দ্র ইত্যাদি নানা কাজে ব্যাপ্ত ছিলেন।

অল ইন্ডিয়া অ্যামেচার অ্যাস্ট্রোনমার্স কনফেডারেশন-এর সম্পাদকরূপে পরপর তিন বছর সারা ভারত সম্মেলন করেছিলেন। যদিও সম্মেলনের ভরকেন্দ্র ছিলেন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ড. নারায়ণ চন্দ্র রানা। তাঁর অসুস্থতার জন্য ও আশীষদার সহযোগিতা না পাওয়ায় কনফেডারেশন অতীত হয়ে গেল। এত বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল যে নিত্য নতুন কিছু না কিছু শুরু করতেন। সেগুলোর সাথে তাল রাখার লোকের বড় অভাব ছিল। তবে আশীষদার কর্মকাণ্ডের সাথে চিরকাল অমলিন থাকবেন জয়া বৌদি ও পীযূষদা। (পীযূষদা কিছুদিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন)। তাঁর একা কাজ করার প্রবণতা থেকে তাঁকে সংগঠন মনস্ক করতে না পারা, আমাদের ক্ষতিই করেছে। সেটা করতে পারলে বাংলার বিজ্ঞান আন্দোলন অন্য পথে চলত।

স্কাই ওয়াচার্স তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলেছে অর্ধ শতাব্দী পূর্তির পথে। আশীষদা, সৌমেনদার পরে আমাদের পেরিয়ে এখন দীপঙ্করদের মতো তরুণদের হাতে তার জয়ধ্বজা সগৌরবে উড্ডীয়মান। তারা কখনই তাদের পূর্বসূরীদের স্বপ্ন ভোলে নি। বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে আকাশকে নিয়ে আসার পথিকৃৎদের মধ্যে আশীষ মুখার্জী সর্বাগ্রে থাকবেন।

উমা

প্রতিবেদন

ঈশ্বর-বিশ্বাস বনাম নাস্তিকতা

দ্বিতীয় নাস্তিক সম্মেলন ২০২৪

বিরাট নীল ফ্লেক্সের উপরে লেখা — 'আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের দাবিকে অস্বীকার করি'। পদযাত্রায় শ্লোগান উঠছে---'দুনিয়ার নাস্তিক এক হও। কখনও ধ্বনিত হচ্ছে---'নাস্তিকতা জিন্দাবাদ', 'মানবিকতা জিন্দাবাদ', 'বিজ্ঞানমনস্কতা জিন্দাবাদ'।

এমন পদযাত্রা দেখে কিছুটা থমকে গিয়েছিলেন বারাসতের কলোনি মোড়ের পথচলতি মানুষেরা। গত মার্চ মাসে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের পা মেলানোর প্রথম এমন ছবি দেখা গিয়েছিল নবদ্বীপের রাস্তায়। চৈতন্যের প্রভাবে ছ'শো বছরেরও বেশি সময় আগে সাাত্বমজিক, সাংস্কৃতিক এবং বিশেষ করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রচলিত ধ্যানধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। সেই চৈতন্যধাম নবদ্বীপের পরে 'নাস্তিক মঞ্চ'-র উদ্যোগে উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলাসদর বারাসতের ব্যস্ততম এলাকায় অনুষ্ঠিত হল রাজ্যের দ্বিতীয় নাস্তিক সম্মেলন। ঐতিহ্যবাহী 'সুভাষ ইনস্টিটিউট'-এর সভাঘরে জেলা তথা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা দিনভর চর্চা করলেন নাস্তিকতার নানা ব্যাখ্যা এবং বর্তমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তার উপযোগিতা নিয়ে। প্রশ্ন তোলা হল, রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় একের পর এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, উৎসবকে উপলক্ষ করে ধর্মীয় উৎসবে সরকারি কোষাগার থেকে বিপুল ব্যয় জোগানো নিয়েও।

বস্তুবাদী দর্শন, বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তনে স্থিত নাস্তিকতাবাদ। উনিশ শতকে চার্লস ডারউইন প্রথম প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিবর্তনবাদের ধারণা দিয়েছিলেন। এই ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী সর্বপ্রথম দেখান, সব প্রজাতিই কিছু সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত। নাস্তিক মঞ্চের সদস্যদের ব্যাখ্যা, ভারতের নাস্তিক ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। ধর্মের উৎস বহুমাত্রিক। তবে অভাব, সঙ্কট এবং ক্ষমতাহীনতা ধর্মের অন্যতম প্রধান উৎস। ধর্ম আবার নিপীড়িতের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয় এবং মানুষের জন্য আফিম। যা কাল্পনিক সুখ দেয়। এমন কাল্পনিক সুখের ভিত্তিতে বেঁচে থাকার উপায় ধর্ম। আবার বিভেদের মূলেও এই ধর্ম।

'ধর্ম আমাদের জাতপাত, অসাম্য আর অশিক্ষা দিতে পারে। তাই একমাত্র পথ হল নাস্তিকতা।' নাস্তিক মঞ্চের বক্তারা এই প্রস্তাবে একমত। ২০২২ সালে একাধিক সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গিয়েছে, প্রায় ১৮ শতাংশ ভারতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। যা সংখ্যার হিসাবে প্রায় ২০ কোটি ছাড়িয়ে যায়। ধর্মীয় মৌলবাদের দাপট যেখানে ক্রমবর্ধমান, তার বিপরীতে এমন পরিসংখ্যান অবাক করে।

ভিড়ে ঠাসা সভাগৃহে অন্যতম বক্তা সমাজকর্মী মীরাতুন নাহারের মন্তব্য, 'নাস্তিকদের কথা শুনতে এতজন মানুষ আসছেন এটা অভিভূত হওয়ার মতো ব্যাপার। কেন না সমাজে এটা উল্টো স্রোতে বয়ে চলা।' আস্তিকতা, নাস্তিকতার ফারাক স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বক্তব্যে তিনি জোর দিচ্ছেন নৈতিকতার মাণদণ্ডটির উপর। সমাজকর্মীর মত, 'জরুরি হল আত্মবিশ্বাস, নৈতিকতা। তর্ক করা এবং প্রশ্ন তুলতে পারা। ধর্ম নৈতিকতাকে জাগাতে পারে নি। নাস্তিকতা তা পারবে।'

জানা গেল, নন্দনে রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে হাতেগোনা কয়েকজনকে নিয়ে ২০২২ সালে নাস্তিক সম্মেলনের সলতে পাকানো শুরু হয়। নবদ্বীপে প্রথম সম্মেলনের সময় নাস্তিক মঞ্চের সদস্য সংখ্যা ছিল খাতায়-কলমে ৬০-৭০ জন। সেটা ছ'মাসে তিনগুণ বেড়েছে। নাস্তিকতার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে একত্রিত হওয়া নাস্তিক মঞ্চের আশা, জাত ব্যবস্থার বিলুপ্তি হবে। সেই লক্ষ্যে জনমত তৈরির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ধর্মীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনমত ও আন্দোলন

গড়ে তুলতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে কর্মসূচি গ্রহণ করছে মঞ্চ। রয়েছে জেলায় জেলায় কর্মসূচির ভাবনা। দাবি উঠেছে, জনগণনার সময় ঘোষিত নাস্তিকদের পরিসংখ্যান সরকারের কাছে নথিভুক্ত করারও।

পিনাকীকুমার গাঙ্গুলী

অক্ষয়কুমার দত্তের ২০৪তম জন্মদিন পালন

ছোট বয়স থেকে বালীর দেওয়ান গাজীর মাজারের উল্টোদিকে জি টি রোডের ধারে জঙ্গলে ঘেরা জমির ভেতরে ভগ্নপ্রায় বাড়িটার প্রতি কৌতূহল ছিল। তখন জানতাম না বাড়িটার ইতিহাস বা ঐতিহাসিক তাৎপর্য। ১৫ জুলাই (২০২৪) সকাল ১১টায় অনুষ্ঠান অক্ষয়কুমার দত্তের ২০৪তম জন্মদিবস অনুষ্ঠান পালিত হয়।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অক্ষয়কুমার গবেষক আশীষ লাহিড়ী, বিদ্যাসাগর ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন সম্পাদক শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, বাংলাদেশের অক্ষয়কুমার গবেষক সহিফুল ইসলাম, বালীর বিধায়ক ড. রানা চ্যাটার্জী ও বালীর বাসিন্দা প্রখ্যাত লেখিকা সুনন্দা শিকদার ও অনেক গুণীজন।

প্রথমেই অক্ষয়কুমার দত্তের প্রতিকৃতিতে পুষ্প অর্পণ করে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তথ্যসমৃদ্ধ ভাষণ দিলেন, যা শুনে অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সমৃদ্ধ হলাম।

অক্ষয়কুমার দত্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের বাড়ির নাম ছিল 'শোভনোদ্যান'। বিদ্যাসাগর মহাশয় নাম দিয়েছিলেন 'চারুপাঠ চতুর্থ খণ্ড'। ১৮ শতকে বাংলা ভাষায় যে রেনেসাঁস ঘটেছিল তার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত।

তৎকালীন যুগে শিশুদের জন্য তাঁর লেখা চারুপাঠ মানুষের কাছে বিপুল সমাদৃত ছিল। জীবনের শেষ তিরিশ বছর তিনি এই বাড়িতেই কাটিয়েছেন। বাড়ির বাগানে দুষ্প্রাপ্য ওষধি বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন। সর্বোপরি বলা যায়, তৎকালীন যুগে বাংলা ভাষার উপর বিদেশী ভাষার আগ্রাসন রুখতে এবং বাংলা ভাষাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে তাঁর দান অনস্বীকার্য।

এই অনুষ্ঠানে সুদূর মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের সাপ্তাহিক ঝড় পত্রিকার সাংবাদিক চন্দ্রপ্রকাশ সরকার এই ছোট্ট অনুষ্ঠানের খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন শুধুমাত্র অক্ষয়কুমারের প্রতি ভালোবাসার টানে। ওপার বাংলার অক্ষয় গবেষক সহিফুল ইসলাম তাঁর তথ্য সমৃদ্ধ মনোগ্রাহী ভাষণ উপস্থিত সুধীজনের মনে দাগ কেটে গেছে। দীর্ঘ এক ঘণ্টার ভাষণে তিনি বাংলা ভাষা ছাড়া আর অন্য কোনো ভাষার ব্যবহার করেন নি। যা আমাকে চমৎকৃত করেছে।

বালীর বিদ্বজ্জনের কাছে আমার আবেদন, বালীর বুকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্তের বাড়িটি ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে। অনেক দেরি হলেও এখনো সময় আছে এই সাহিত্য স্রষ্টার স্মৃতি বিজড়িত ভবনটির আমূল সংস্কার ও সাহিত্য গবেষণাগার গড়ে তোলার। আসুন, সবাই মিলে এই মহৎ কাজে হাত লাগাই। যাতে এই সাহিত্য মন্দিরটি বালীর গর্ব হয়ে উঠতে পারে।

অঞ্জন ঘোষ

আমার দেখা এপিডিআর-এর গণ কনভেনশন

গত ২৩ আগস্ট ২০২৪ বিকেল ৫টায় গিয়েছিলাম বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটে ভারত সভা হলে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির ডাকে আর জি কর মেডিকেল কলেজে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ন্যায় বিচার ও অন্যান্য দাবিতে এক গণ কনভেনশনে যোগ দিতে। শত বর্ষ পেরিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত ও বহু ইতিহাসের সাক্ষী ভারত সভা হলে উপস্থিত হয়ে বেশ রোমাঞ্চ লাগছিল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে হত্যাকাণ্ডে নিহত মহিলা ডাক্তারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হল। তারপর এপিডিআর তথা অন্যান্য সংগঠনের পক্ষে আর জি কর কাণ্ডের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দাবিতে বক্তব্য রাখলেন ঠিকই কিন্তু আমার মনে হল বক্তাদের বেশিরভাগের বক্তব্যই অন্তঃসারশূন্য। তাঁরা এনকাউন্টার বা ফাঁসি চাইছেন না, চাইছেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। কিন্তু শাস্তিটা কি সেটা কেউই বললেন না। কাকে বা কাদের দোষী মনে করা হচ্ছে তাদের নাম বলতে বেশিরভাগ বক্তাই দ্বিধা বোধ করছিলেন। এর মধ্যে কিছুটা সাবলীল ও স্পষ্ট কথা বললেন বোলান গাঙ্গুলি। তবে একটা কথা না বললেই নয়, কয়েকজন নবীন চিকিৎসক ও অন্য পেশার যুবক যুবতীদের ভাষণ সবার মনকে নাড়া দিয়েছে। সবচেয়ে ভালো লাগল শতাব্দী দাসের ভাষণ। উপস্থিত দর্শকদের মনকে ধাক্কা দিয়েছে প্রিয়স্মিতার ভাষণ।। প্রিয়স্মিতার দেওয়া ভাষণই এই প্রতিবেদনের অনুপ্রেরণা। সভার শেষ লগ্নে বাঁশী বাদন বেশ বেমানান মনে হল। ছোট্ট এই সভাগৃহে শুরুতে আনুমানিক

১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে মহিলার সংখ্যা জনা চল্লিশ। যখন নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কনভেনশন হচ্ছে সভার মাঝখানেই নারীরা তো বটেই, সেই সঙ্গে পুরুষরাও অনেকেই হল ছেড়েছেন।

এই কনভেনশনে বক্তাদের বেশিরভাগের অভিমত হল নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরব হওয়া। যদিও আমাদের সমাজে ঘরে ও বাইরে নারীরাই বেশি নির্যাতনের শিকার হন, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু নারীরা ছাড়াও অনেক মানুষ নির্যাতনের শিকার হন। এক বছর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদ থেকে ফেলে দিয়ে যে ছাত্রকে মারা হয়েছিল সেও নির্যাতনের শিকার ছিল। তাই আন্দোলন সমাজে সকল নির্যাতনের বিরুদ্ধেই হওয়া প্রয়োজন। একথা সভার বক্তাদের দু-একজন ছাড়া কেউই উল্লেখ করেন নি।

অঞ্জন ঘোষ

গত ২৭ জুলাই ২০২৪, বিবর্তন বিজ্ঞান সংস্থার উদ্যোগে চন্দননগরে গিরিদূত সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় একটি আলোচনা সভা। সুবীর পোদ্দার স্মারক বক্তৃতার বিষয় ছিল— কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা: সম্ভাবনা ও সংশয়। আলোচক ছিলেন শ্রীমতি মালবিকা ঘোষ—গবেষক ও বিজ্ঞান লেখক। শ্রীমতি ঘোষ কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ পদে কর্মরত থেকেও বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার কাজে ব্রতী হয়েছেন। প্রথমে বিজ্ঞানকর্মী, লেখক ও সম্পাদক সুবীর পোদ্দার সম্বন্ধে স্মৃতিচারণা করেন ভাস্কর সুর। স্বপ্না ঘোষের রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং রাজেশ দত্ত-র স্বরচিত গান পরিবেশনের পর শুরু হয় মূল আলোচনা। বক্তা বলেন, এ আই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব আমাদের সমাজজীবনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, কৃষি ও নিরাপত্তার কাজে এ আই ব্যবহার হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে এ আই-এর ইতিহাস তুলে ধরেন। ১৯৯৭ সুপার কম্পিউটার ডিপ-ব্লু বিশ্বের সেরা দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভকে হারালে বিশ্বে আলোড়ন পড়ে যায়। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, তার থেকেও শক্তিশালী প্রতিপক্ষ আছে এবং তা মানুষেরই তৈরি। মানুষের মস্তিষ্কের অনুকরণ করে নিউরাল মডেল রোবট তৈরি করেন ব্রিটিশ-কানাডিয়ান বিজ্ঞানী জেফরি হিল্টন। এখন বিজ্ঞানীরা এই নিউরাল মডেল ব্যবহার করে আরও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার তৈরির কাজ করছেন। তবে মানুষের মস্তিষ্কের সমতুল্য নিউরাল মডেল তৈরি করা এখনও সম্ভব হয় নি। এর ফলে কর্মসংস্থান সংকুচিত হলেও, এ আই প্রযুক্তি-জানা ব্যক্তিদের চাহিদা বাড়বে বলেই তাঁর মনে হয়েছে। এই প্রযুক্তি বিভিন্ন গোষ্ঠী নানান খারাপ কাজেও ব্যবহার করতে পারেন বলে আশঙ্কা রয়েছে, সে কারণে সরকারের সতর্ক নজরদারি জরুরি। উপস্থিত শ্রোতাদের নানান মতামতের উপর বক্তা নিজস্ব মতামতও দেন। অনুষ্ঠান শেষে কল্লোল দাস ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট অধ্যাপক শ্রী বরুণ দত্ত।

প্রশান্ত দাস বিবর্তন বিজ্ঞান সংস্থা। চন্দননগর, হুগলী।

চলে গেলেন বিবেক সেন
(১৯৩৪-২০২৪)

উৎস মানুষের সঙ্গে আবহবিজ্ঞানী বিবেক সেনের যোগাযোগ করিয়ে দেন আরেক আবহবিজ্ঞানী অঞ্জন কুমার সেনশর্মা। তখন বিবেকবাবু ৮০ পার করেছেন। প্রথম অনুরোধেই লেখা দিলেন। সেই

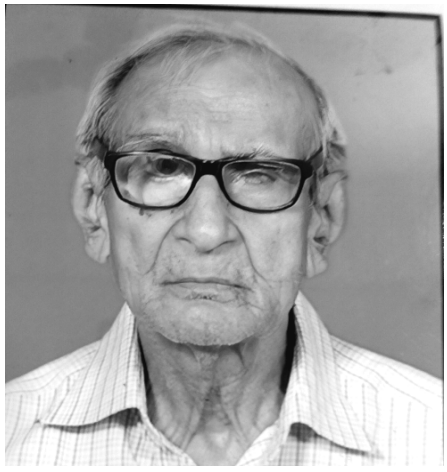

শুরু। তারপর আরো কিছু লেখা পেল উৎস মানুষ। আবহাওয়া বিজ্ঞানের মতো নিরস বিষয়কে প্রাঞ্জল করে পাঠকের কৌতূহল জাগানোর মতো করে লিখলেন বিবেক সেন। বড্ড দেরিতে যোগাযোগের কারণে উৎস মানুষ ওঁর লেখা থেকে বঞ্চিত হল। উৎস মানুষ হারালো এক বিদগ্ধ আবহবিজ্ঞানীকে। প্রয়াত বিবেক সেনকে আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 30.00
৪৪তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪ ৩০.০০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইয়ের জন্য যোগাযোগ— সুমন্ত বিশ্বাস।
ফোন— ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯১৪৩৭৮৬১৩৪

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইগুলি অনলাইনে অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। যোগাযোগ—হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**
ফোন নং : +৯১ ৮৩৩৬৯৪১১০৮

গ্রাহক চাঁদা (বাৎসরিক) ১৫০ টাকা (চারটি সংখ্যার জন্য) উৎস মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া যায়। স্পিড পোস্টে নিলে ২৫০ টাকা জমা দিতে হবে। (জানুয়ারি ২০২৫ থেকে)

Punjab National Bank,
College Street Branch,
Kolkata - 700073.
UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838. IFSC NO. PUNB0008320

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে ফোনে বা ই-মেলে নাম, ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নং ও ই-মেল দেবেন আর কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হবেন তা জানাবেন। সাধারণ ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয়। ডাকে পত্রিকা না পেলে আমরা সংখ্যাটি দ্বিতীয়বার পাঠাতে পারব না। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা করা হয়।

ওয়েবসাইট : **https://www.utsomanush.com**
ই-মেল : **utsamanush1980@gmail.com**
Facebook : https://www.facebook.com/

পুস্তক তালিকা

জল-জমি-জঙ্গলের খোঁজে:	
বোলান গঙ্গোপাধ্যায়	১৫০.০০
স্বাস্থ্যের সাতকাহন : গৌতম মিস্ত্রী	(১ম খণ্ড যন্ত্রস্থ)
আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি: আশীষ লাহিড়ী	৮০.০০
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ: সমীরকুমার ঘোষ	১৫০.০০
বাঁধ বন্যা বিপর্যয় (সংকলন)	২০০.০০
আহরণ (সংকলন)	২০০.০০
যে গল্পের শেষ নেই: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৫০.০০
প্রতিরোধ : সম্পা: (ঐ)	১৩০.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (সংকলন)	২০০.০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (সংকলন)	১৫০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	
নিরঞ্জন ধর	১২০.০০
প্রমিথিউসের পথে (সংকলন)	৫০.০০
লেখালিখি: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি	
অনু : প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৬০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন)	১২০.০০
গুমোট ভাঙার গান: ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	১৫০.০০
নিজের মুখোমুখি: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫০.০০
এটা কী ওটা কেন (সংকলন)	৫০.০০
মূল্যবোধ (সংকলন)	৮০.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ:	
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু:	
হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, সেতু প্রকাশনী, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট), রথীনদা (গোলপার্ক). ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (সূর্য সেন স্ট্রীট) । জ্ঞান বিচিত্রা ১৮বি/১বি, টেমার লেন। প্রতিক্ষণ, ৫ সূর্য সেন স্ট্রীট।

হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং দি নিউ জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।